তত্ত্বনির্ণয়।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

TATTVA NIRNAYA.

PART I.

BY

DENONATH BANERJEE.
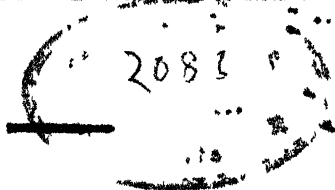
Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY M. M. RUKHIT
AT THE INDIAN MIRROR PRESS.
6, College Square, East.

1879.

Price 8 annas.

The *Academy*, a high class literary journal of England, contains the following review by Professor Max Muller, on the Tattwa-Nirnaya:—

"There is a curious literature growing up in India which attracts far too little attention in England. It has long been known that many of the popular books of the day which occupy society for a few years till they are superseded by others are eagerly read by natives who have received their education at English schools and colleges. But it is much less known that many of these books are not only read, but carefully criticised, by natives, and that almost every post brings us reviews or pamphlets, written in Indian *vernaculars*, and containing curious examinations of the latest theories advanced by English philosophers. We have just received the first part of a work called *Tattva-nirnaya* (*i. e.*, Examination of the Truth). by Denonath Banerje, published at Calcutta so long ago as 1879. It is written in Bengali, and treats of the following subjects:—(1) "Atoms and Animals" (a criticism of Prof. Tyndall's theory); (2) "Transformation of Animals and Vegetables" (a criticism of Darwin's theory); (3) "Primary Condition;" (4) "Soul and Brain;" (5) "Imortality of the Soul;" (6) "Free will;" (7) "Automatism;" (8) "Nature and the Self-existent;" (9) "Immutable Relation between Creator and Creation" (a criticism of J. S. Mill); (10) "First Cause" (a criticism of Comte); (11) "Existence;" (12) "Creator and Constructor," (13) "Pantheism" (a criticism of the pantheistic doctrins of the day). Though the treatment of these great questions is slight, yet as a phase of thought it is interesting; and the future historians of India will find it very difficult to write his chapter on the renaissance of Indian literature in the nineteenth century unless some of our public libraries make a great effort to collect such books as Denonath Banerjee's *Tattva-nirnaya*, and preserve them for use, if not at present, at all events in the future.—*Academy*.

উৎসর্গ
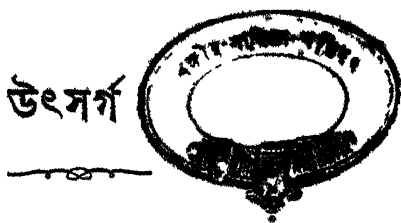
পরমশ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় ৺গোলোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঠাকুরদাদা মহাশয় শ্রীচরণেষু।

পদপ্রান্তপ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার প্রযত্নে এবং অকৃত্রিম স্নেহে আমার এই শরীরাদি পরি রক্ষিত হইয়াছে। আপনার সদৃশ ভালবাসা এ জগতে আর পাইলাম না। আপনি আমার ইহলোক পরলোকের উপদেষ্টা ও শ্রেষ্ঠ গুরু এবং প্রতিপালক। আপনা অপেক্ষা আমার শ্রদ্ধেয় এবং ভালবাসার স্থান এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। আপনার আশীর্ব্বাদের ফলস্বরূপ এই "তত্ত্বনির্ণয়" পুস্তক খানি অপর কাহাকেও উৎসর্গ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্য আপনার স্বর্গীয় আত্মাকে এই তত্ত্বনির্ণয় উৎসর্গ করিয়া জীবনকে সার্থক করিলাম ইতি।

গয়লগাছা, জেলা হুগলী
সন ১৮৭৯।

আপনার চিহ্নিত সেবক,
শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

ভূমিকা।

এই "তত্ত্ব-নির্ণয়" খানি বঙ্গদেশীয়া ভগিনীদিগের পাঠ্যপুস্তক হইবার জন্য প্রণীত হইল। দিন দিন বঙ্গভাষার উন্নতি হইতেছে,— স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে; বঙ্গদেশীয়া ভগিনীগণ নানাপ্রকার পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন, অনেক ভগিনী বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, বিশুদ্ধ রীতি-নীতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, তত্রাচ তাঁহাদের হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তার স্থায়িভাব প্রায়ই দেখা যায় না। সমুদ্রের তরঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হইলে সেই পুষ্প-গুলিন যেমন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, স্বাধীন ভাবে স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ বঙ্গদেশীয়া সুশিক্ষিতা ভগিনীগণ নানারূপ মতের তরঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয় বর্ত্তমান সময়ে যদিচ অল্পমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহাদের বিশ্বাস এবং হৃদয় নানারূপ বিকৃত ভাবে বিক্ষিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এক দিকে অল্পে অল্পে যেমন অনেক কুসংস্কার চলিয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধভাব হৃদয়ে সংগৃহীত না হইলে অন্যরূপে নানাপ্রকার কুসংস্কার জড়িত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। স্বাধীন-চিন্তা শূন্য হইয়া কেবল মাত্র তোতা পাখীর ন্যায় কতকগুলিন পুস্তক কণ্ঠস্থ করিলেই স্ত্রীজাতির জ্ঞানের উন্নতি, কুসংস্কারের অবনতি হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না। সেই জন্য যাহাতে বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণ অল্প পরিমাণে স্বাধীনভাবে চিন্তা শিক্ষা করিতে সমর্থা হন, তজ্জন্যই এই "তত্ত্বনির্ণয়" ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত করিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

তত্ত্বনির্ণয়ের ভাষা সরল করিবার জন্য প্রচলিত সরল গ্রাম্য ভাষাই ব্যবহার করা হইয়াছে। একে বিষয়গুলিন কঠিন, তাহার উপরে কঠিন ভাষাতে এই সব বিষয় লিখিত হইলে পাছে, তত্ত্বনির্ণয়

একখানি প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র হইয়া পড়ে,—পাছে ভগিনীদিগের দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বিশুদ্ধ ভাষার নিকটে একটুকু অপরাধী হইতে বাধ্য হইলাম; বিশেষতঃ তত্ত্বনির্ণয়ে যে তিনটী কল্পনার ছবি প্রদান করা হইয়াছে, তাঁহাদের স্ত্রীপ্রকৃতি, তাঁহাদের মুখ হইতে পাকা সাধুভাষা প্রকাশিত হইলে অতিশয় শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল; আরও বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা প্রদানও তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যও নহে, পাঠিকা ভগিনীগণ অতি সহজ উপায়ে স্বাধীনভাবে অল্প পরিমাণে তত্ত্বচিন্তা করিবার উপায় শিক্ষা করিতে পারেন, এইটীও যখন উদ্দেশ্য, তখন যাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করেন; এবং ভাল বাসেন, তাঁহারা আমার ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধীয় ক্রুটি ক্ষমা করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করাও আমার পক্ষে অসঙ্গত বোধ হয় না। ভাষা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের এবং পুরুষের রুচিও যে বিভিন্নরূপ, তাহা একটুকু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই সাহসে তত্ত্বনির্ণয়ের বিষয়গুলি যত সহজ উপায়ে পাঠিকা ভগিনীদিগের বোধগম্য হইতে পারে, সে সকল উপায় অবলম্বন করিতে সাধ্যানুসারে ক্রুটি করা হয় নাই। তবে দয়ার মুখ হইতে যেরূপ ভাষা প্রকাশিত হওয়া উচিত, তৎপ্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিতেও ক্রুটি করা হয় নাই; তত্রাচ স্থানে স্থানে আরও সরল করিবার ইচ্ছা থাকিতেও বাহুল্য হইবার আশঙ্কায়, একটু একট গভীর ভাবের—গভীর চিন্তার বিষয় রহিল; এক সাজী প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্যে দুটী দশটী অর্দ্ধস্ফুটিত অথবা কলিকা থাকা অসঙ্গতও না হইতে পারে। বিশেষতঃ পাঠিকা ভগিনীগণও কিছু শিশুশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াই তত্ত্বনির্ণয় অধ্যয়ন করিবেন তাহাও তো নহে; তখন যে যে স্থানে একটু একটু গভীর চিন্তার বিষয় আছে, বোধ করি, তখন তাঁহাদের নিকটে তত দুর্ব্বোধ না হইতেও পারে।

তত্ত্বনির্ণয়ের বিষয় গুলিন এখানে উল্লেখ করা পুনরুক্তি মাত্র, তাহা সূচীপত্রেই তো প্রকাশিত আছে। তবে পাঠিকা ভগিনীদিগকে এই স্থানে একটী বিনীতভাবে নিবেদন করি, তত্ত্বনির্ণয়-মধ্যে দয়া, মায়া, সরস্বতী, এই তিনটী যে কল্পনার আদর্শ ভগিনীদিগের সহিত যখন সাক্ষাৎ করিবেন, তখন সরস্বতী এবং মায়াকে একটু বিশুদ্ধ পবিত্র-ভাবব্যঞ্জক পরিহাসপ্রিয়তা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ না করেন। স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা এবং সরলতা কোন বিজ্ঞান অথবা তত্ত্বজ্ঞান কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং হওয়াও উচিত নহে; অরুচিকর ঘৃণিত পরি-হাস-প্রথাকে বিদূরিত করিয়া বিশুদ্ধ পবিত্রভাবব্যঞ্জক পরিহাস-শিক্ষা দিবার জন্যই সরস্বতী এবং মায়া তত্ত্বনির্ণয় হস্তে এক এক সময়ে পাঠিকা ভগিনীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, পাঠিকা ভগিনীগণ দয়ার সদৃশ সরস্বতী এবং মায়াকেও সমান ভাবে সমাদর করেন এটীও প্রার্থনীয়। বিশুদ্ধ পরিহাস এবং সরল বিশ্বাসের আধা-রই সরস্বতী; একদিকে বিশ্বাস অপর দিকে অবিশ্বাস তাহার মধ্য-বর্ত্তী হইয়া কিরূপ অবস্থাপন্ন হইতে হয়, অনেক সদ্‌গুণ সত্ত্বেওতাহা-রই আদর্শ মায়া;—আর বিশুদ্ধতা, নিরপেক্ষতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যার, উন্নতভাব, সরলতা, উদারতা, কোমলতা, ঈশ্বরানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার কিরূপে হওয়া যায়, দয়ার আদ-র্শই সেই শিক্ষার উপযোগী, এখন পাঠিকা বঙ্গমহিলা ভগিনীগণ দয়ার সদৃশ আদর্শ হইয়া বঙ্গবাসীদিগের প্রত্যেক গৃহকে উজ্জ্বল করেন,—বঙ্গদেশকে স্বর্গধাম করেন, এইটীই প্রার্থনীয়। দয়াময় ঈশ্বর, আমার কি এই বাঞ্ছা সম্পূর্ণ করিবেন? তা তিনি জানেন; একটী ভগিনীরও যদি তত্ত্বনির্ণয় শিক্ষা করিয়া দয়ার সদৃশ দুর্গতি হয়, তাহা হইলেও আমার এই পরিশ্রম সার্থক হইবে,—মানবজীবন কৃতার্থ হইবে।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই তত্ত্বনির্ণয় মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কাসিমবাজারের বিখ্যাত দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সিঁ, আই, মহাশয়া এককালীন দুই শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে এই পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তত্ত্ব নির্ণয়।

প্রথম ভাগ।

দয়া। আচ্ছা মায়া—তুমি এখন কেমন্ কেমন্ এক রকম হয়েগেছ কেন বল দেখি? ক্রমে ক্রমে তোমার খারাপ্ তামাসাতে খারাপ্ কথাতে এত রুচী বাড়্‌ছে কেন? তোমার একরূপ গম্ভীর প্রকৃতি ছিল, তখন তোমার সঙ্গে কথা বলিতে আমার তো দূরে যাউক, শিব বাবুর পর্য্যন্ত ভয় হইত, এখন তুমি এমনি হাল্‌কী হয়ে পড়েছ যে তোমার কথা শুনে হাসিও পায় দুঃখও হয়।

মায়া। আচ্ছা দয়া! তুমি যদি আমাকে তর্কে হারাতে পার, আর আমার বিশ্বাস সুদ্‌রে দিতে পার তো তুমি যা বলিবে তাই কর্‌বো; না হলে তুমি আমার শিষ্যি হবে প্রতিজ্ঞা কর।

দয়া। আমি তত জাঁক্‌ করিতে পারি না, তবে তোমার যে সব মতের গোলমাল হয়েছে তা বল, যে টুকু জানি তার উত্তর দেব।

পরমাণু ও জীব প্রকরণ।

মায়া। আচ্ছা, দয়া! কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের এইরূপ মত যে, পরমাণু ভিন্ন জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা আর কেহই নাই। ঐ পরমাণু সকলের পরস্পর এমন শক্তি আছে যে তাহারা আপনা আপনি শরীর

গড়ে নেয়, সেই পরমাণুর দ্বারাই এই জীব জন্তু গাছ পালা পাহাড় পর্ব্বত জগৎ সংসার আপনা আপনি সৃষ্টি হইতেছে। তার প্রমাণ স্থলে স্পষ্ট দেখা যায়, যখন মিশ্‌রীর রস থেকে মিশ্‌রীর দানা বাঁধে সে সময়ে ঐ পরমাণু সকল কেমন আপনা আপনি স্বজাতীয় পরমাণুকে টেনে নিয়ে মিশ্‌রীর দানা শরীর সংগঠন করে থাকে?—নুন, জলে ফেলিলে, আবার তাহার পরমাণু পরস্পর স্বজাতীয় পরমাণুকে কেমন টেনে নিয়ে চাপ্‌ড়া বেঁধে যায়,—গোলকের পাল প্রস্তুত কর্‌বার সময়ও ঐরূপ ঘটনা দেখা যায়, তখন পরমাণুর দ্বারাই—পরমাণুর আকর্ষণী শক্তির দ্বারাই এই সব জীব এবং গাছপালা, সকল স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি হয়েছে এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত কর্‌বার বাধা কি?

দয়া। ভাল তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—এই মানুষ কিম্বা জন্তুদিগের শরীরে যত প্রকার পরমাণু আছে, তাহা পৃথিবীর সৃষ্টি কালেও ছিল এখনও আছে তো? আর সেইরূপ আকর্ষণী শক্তি ও তো আছে।

মা। তা ছিল বৈ কি, এখনও অবশ্যই আছে।

দ। তা হলে এখন সেই রূপ পরমাণুর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা মানুষ প্রস্তুত না হয় কেন? যখন সেই সকল উপাদানই আছে, তখন সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষ উৎপত্তি হয় না কেন? আচ্ছা, পরমাণুর জ্ঞান এবং বুদ্ধি আছে কি, না?

মা। তা কেন থাকবে? সে সব পরমাণু যে জড় পদার্থ।

দ। তবে, যাহাতে পুত্র কন্যা অবিবাদে উৎপত্তি হতে পারে, পরমাণুর এমন বিচার করে বুদ্ধি খাটিয়ে স্ত্রী, পুরুষ সংগঠিত কর-বার শক্তিতো নাই? জ্ঞান না থাকলে—বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি না থাকলে স্ত্রী পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হবে, কতকগুলি স্ত্রী, কতকগুলি পুরুষ হয়ে সৃষ্টির বৃদ্ধি করিবে, এমন জ্ঞান শক্তি, বুদ্ধি শক্তি কৌশল শক্তি যখন পরমাণুর নাই, তখন স্ত্রী, পুরুষ সৃষ্টি এই অজীব

জ্ঞানের এবং বুদ্ধির অথবা কৌশলের কার্য্য, অজ্ঞান অচেতন জড় পরমাণুর দ্বারা কেমন করে হইল? সন্তান কন্যা উৎপন্নের দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন আধার সৃষ্টি, অচেতন অজ্ঞানী পরমাণুর দ্বারা কেমন করে সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা? তাহা হইলে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের এই যে অচিন্ত্য জ্ঞানের সৃষ্টি, অজ্ঞানী, জড় পরমাণুর দ্বারা কোন মতেই তো হইবার সম্ভাবনা নাই? পরমাণুর কৌশল শক্তি আছে,—পরমাণুর বিচার শক্তি এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞতা অসীম জ্ঞান শক্তি আছে, হয় এই কথা স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ পরমাণুর অতীত জ্ঞান সম্পন্ন কৌশল সম্পন্ন একটী পৃথক্ সৃষ্টি কর্ত্তা আছে এই রূপ স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমটী স্বীকার করা হইলে অদ্বৈতবাদ, "জগৎ ব্রহ্মময়" "জ্ঞানময় জগৎ" এইটী স্বীকার কর্ত্তে হয়; এবং দ্বিতীয়টী স্বীকার করিলে, পরমাণুর জড়ত্ব, এবং এক জন কৌশল সম্পন্ন অসীম জ্ঞান সম্পন্ন সৃষ্টি কর্ত্তাকে স্বীকার না করিয়া থাকিবার যোটী নাই।

মা। তা, তা, বলি আচ্ছা, এই যে, জড় পদার্থ দ্বারা, এই লোহা লক্কড় নানা ধাতুর দ্বারা নানা প্রকার পুতুল,—নানা প্রকার সব যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে,—কলের পাখী আপনি ডাকে,—কলের পালক ডানা বিস্তারিত করে উপরেতে উড়ে যায়, কলের গাড়ী, কলের মানুষ আপনি চলে, আপনা আপনি নানা রূপ অঙ্গ[illegible]ী করে, তাও তো সব পরমাণুর সংযোগেই হয়ে থাকে?

দ। ভাল উৎপাৎ দেখি? বলি সেই ধাতু গুলিকে সংযোগ করে, যাঁরা সেই সব কলের পাখী, পুতুল, গাড়ী ডানা প্রভৃতি প্রস্তুত করে ছিলেন, তাঁদের জ্ঞান আছে কি না বল দেখি? জ্ঞান বুদ্ধি কৌশল সম্পন্ন জীবে অর্থাৎ মানুষে ঐ সকল পরমাণু অথবা পদার্থ সংযোগ করে, যেখানে যেটী খাটে; এইরূপ উপাদান দিয়ে ঐ সকল যন্ত্র অথবা কলের মানুষ কলের পাখী ইত্যাদি প্রস্তুত করেছে কি না বল দেখি?

মা। তা তো করেছেনই বল্‌তে হবে।

দ। তা হলে আর আপত্তির বিষয় কি? তাহলে জড় পরমাণুর, এতে সৃষ্টির ক্ষমতা কোথায় রহিল? ঐ সকল সৃষ্টির ক্ষমতা, মানুষের জ্ঞানের এবং বুদ্ধিরই তো বল্‌তে হবে? যদ্যপি আপনা আপনি ঐরূপ পরমাণুর আকর্ষণে পুতুল, পাখী প্রস্তুত হ'ত, আর তাদের ছানা পোনা হত, তাহলে জড় পরমাণুর সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা স্বীকার কর্‌বার বাধা ছিল না; কিন্তু তা হলে জড় পরমাণুর জ্ঞান শক্তি,—বুদ্ধি শক্তি থাকা, চেতনা শক্তি ত্রিকালজ্ঞতা, এ গুলিন ও স্বীকার কর্‌তে হত। জড় পরমাণু এক জোড়া অথবা দুইদশ জোড়া স্ত্রী পুরুষ গড়ে দিয়ে, জগৎ চালাবার উপায়টী করে দিয়েই প্রকৃতি সাগরে ডুব্ মেরে অন্তর্দ্ধান হয়েছে না কি? একি ঘোর্ ছেলে মানুষী কথা নহে? এক-বার জীব শরীরের প্রতি চেয়ে দেখ্ দেখি, একবার মনো রাজ্যের ব্যাপার অনুসন্ধান কর্ দেখি, যেটী যেখানে আবশ্যক, সেইটী সেই স্থানে ঠিক্ আছে দেখ্‌তে পাবে, তা হলে অনেক ধাতুর আকর পর্ব্বত সকল হতে ছেলে উৎপন্ন হবার বাধা থাকৃত কি? পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগ হইবার শক্তি আছে, কিন্তু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তিষ্ক রক্তের আধার ফুশফুস্, পাকস্থলী, অন্নাদি জীর্ণ হইবার প্রধান সামগ্রী প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি প্রস্তুত এবং সেই গুলিকে রক্ষা করিবার বিশেষ কৌশল সকল যে [illegible]র্থের ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই, এমন জড় পরমাণুর দ্বারা, এমন অন্ধ অজ্ঞান শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, এরূপ কি বিচার শক্তি সম্পন্ন লোকে বিশ্বাস কর্‌তে পারে? পাছে, মাথায় আঘাত লাগ্‌লে মস্তিষ্ক নড়ে চড়ে, তাহলে একেবারে মনুষ্যত্ব ধ্বংশ হয়ে যাবে, সেই জন্য মাথার খুলির একবার বাঁধা বাধুনি শক্ত হাড়ের কাণ্ড কারখানা, দেখ, পাছে মনুষ্যের মাথাতে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাহা রক্ষার জন্য এইরূপ আবরণ স্বরূপ কাল চুলে মাথা পরিপূর্ণ;—পাছে চক্ষের মধ্যে ধুলা খোকা পড়ে চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়, তাহার নিবারণ জন্য

চক্ষের সম্মুখে চুলের এবং অতি সূক্ষ্ম চর্ম্মের পর্দ্দা ;—পাছে যোড় খিলান্ সকল শুকয়ে বেকল হয়ে যায়, তার নিবারণ জন্য শীরদাঁড়ায় গেঁটে গেঁটে তেলের মতন তরল পদার্থের কৌটার মতন যন্ত্র এবং তাতে ঐরূপ তৈল ঘৃতের মত সর্ব্বদা তরল বস্তু সঞ্চিত থাকে, এবং হাত, পা, আংউল প্রভৃতির গাঁইটে ঐ রূপ কৌশল ; পাছে মন্দ পচা-পাচ্‌কো দ্রব্যের পরমাণু বাতাস্ দ্বারা রক্তের ফুস্‌ফুস্‌তে প্রবেশ করে সেই আপদ নিবারণ জন্য নাকের চর্ম্মে দুর্গন্ধ প্রবেশ হবা মাত্রই তাহা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে তাড়ুয়ে দিতে পারা যাবে, নাকের ভিতরের সূক্ষ্ম চর্ম্মের এইরূপ প্রকৃতি, পাছে খাবার সময়ে নিশ্বাস ফেলিবার নল্লীতে খাবার দ্রব্য প্রবেশ করে মানুষের দম্ আট্‌কে প্রাণ বাহির হয়, তাহার নিবারন উপায় আলজীব নামে এক খানি চর্ম্মের পর্দ্দা ঐ দুই নালীর মধ্যে রক্ষিত, এবং তাহার অঙ্গে কোন দ্রব্য লাগিলে সেই চর্ম্ম তখনই ঝাপ্‌টা মেরে সেই বস্তুকে উঠাইয়া দিবে, এমন প্রকৃতির চর্ম্ম সেই স্থানে সংস্থাপন করা, বিষম লাগিবার সময়ে ঐ চাম্‌ড়াতেই খাদ্য দ্রব্যের কুঁচো লাগ্‌লেই সেই চর্ম্ম ঝপেটা দিয়ে ঐ দ্রব্যকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে, তাতেই কাসিতে হয় রক্তের সঙ্গে অপর কোন দ্রব্য রক্ত পরিষ্কার স্থলীতে না যেতে পারে সে জন্য রক্ত নলির মুখের চর্ম্মের সংকোচ এবং বিস্ফারিত হইবার প্রকৃতি,—বদ্ রক্ত এবং ভাল রক্ত এক সঙ্গে মিশ্‌য়ে পাছে শরীর নষ্ট হয়, তাহ নিবারণ জন্য বদরক্ত নিকাশ্ হবার একটী পৃথক নালী, ভাল রক্ত সঞ্চালিত হইবার পৃথক নালী, অথবা শীরা সকল মধ্যে সংস্থাপন করা ; মাথার মধ্যে মস্তিষ্কোতে বেশী রক্ত গিয়া মাথা গরম করে মানুষকে নষ্ট না করিতে পারে, সেই জন্য খুলিতে সূক্ষ্ম শীরার দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের কৌশল, আর কত বলিবে ? এই সকল ভবিষ্যতের অনিষ্ট নিবারন্ আশঙ্কা দূর করে মানুষের অথবা জীবের শরীর নির্ম্মাণ হয়েছে ; তখন যে সকল জড় পরমাণুর আদৌ জ্ঞান নাই, এবং অচেতন পদার্থ বলেই

সর্ব্বতঃ ভাবেই স্বীকৃত, সেই সকল পরমাণুর ভবিষ্যৎ চিন্তা থাকা, তাহাদের ভবিষ্যৎ অনিষ্ট নিবারণের জ্ঞান থাকা, এবং ভবিষ্যৎ অনিষ্টের নিবারণ উপায় বিধান করিয়া মানুষ সকল, অথবা অপরাপর কৌশল পূর্ণ জীব সৃষ্টি করা কি রূপে সম্ভব হতে পারে? যে সকল পদার্থের জ্ঞান নাই, এমন সকল, বৃক্ষ লতাও তাদের শরীর,—গুঁড়ি, পাতা, ফুল, গর্ভকেশর ফল, বীচী, প্রভৃতিরও ভবিষ্যৎ অনিষ্ট আশঙ্কা নিবারণ করিয়া কৌশল পূর্ণ শরীরাদি পাইয়াছে ; যে সব জড় পরমাণুর কেবল মাত্র তাড়ানা, আর গ্রহণ করা এই দুই অন্ধশক্তি ভিন্ন আর কোনরূপ জ্ঞান বুদ্ধি কৌশল প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই পরমাণু দ্বারা বুদ্ধির কার্য্য চিন্তার কার্য্য, বহুদর্শিতার কার্য্য, অসীম জ্ঞানের কার্য্য সকল সম্পাদিত কি রূপে হইতে পারে? জ্ঞান বিহীন, কেবল মাত্র অন্ধশক্তি বিশিষ্ট পরমাণু, স্বয়ং সিদ্ধ ভাবে এই কৌশলময় জগৎসংসার সৃষ্টি করিয়াছে, যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ভারি ভুল।

মা। কেন! এই যে দেখাযায়, যখন শরীরে কোন অংশে কাঁটা ফুটে যায়, তখন শরীরের রক্তের পরমাণু সকল, সেই মাংসভেদী কাঁটার চারিধারে একেবারে গড়বন্দী করে ঘেরে রাখে, কোনমতেই বিজাতীয় পরমাণু বিশিষ্ট পদার্থকে আপনাদের সঙ্গে মিশ্রিত হতে দেয় না, এমন কি সেই স্থানে রক্তের পরমাণু জমে কঠিন মাংস হয়ে যায়, তাহার পার্শ্বদিয়ে রক্তের [illegible] চলাবুলি করিতে থাকে ; সেই জন্য কাঁটা ফোটা স্থানটী জাম্‌ড়া পড়ে যায়। আরও দেখ, যখন, শরীরের ত্বক গরম, রুক্ষতা এবং অপরিস্কার থাকে, তখন চুলকনা, খোস্‌, দাদ, ব্রণ প্রভৃতি নানা প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয় ; তাহার কারণ কি তা জান? অতি ক্ষুদে ক্ষুদে নানা জাতীয় কীটাণু শরীরের উপরের চর্ম্মতে, উৎপত্তি হইয়া শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, (১) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের

(১) প্রিন্সিপলস্ এণ্ড প্রাকটিস্ অব মেডিসন্ বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

দ্বারা ঐ সকল কীটের শরীর বেস্ দেখা যায়। ঐ সকল কীট যখন চর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বোধ হয় শরীরের রক্ত তাহাদিগকে বাহিরে তাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে (২) সর্ব্বদাই ঐ কীটের উপরে রক্ত প্রবাহ প্রতিঘাত করে, এবং সেই সকল কীটকে গড়বন্দী করে ঘেরে রাখে, এবং উপরদিকে ঠেলে উঠাইবার চেষ্টা করে, সেই জন্য শরীর চুল্কাইতে থাকে, নূতন রক্ত পরমাণু অন্যদিগদে গতায়াত করে, তখন পুরাতন এবং একস্থানে স্থিত কলুষিত রক্ত সকলকে ভাল পরিষ্কার রক্ত প্রবাহ তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে, তখন চুলকাইতে থাকে এবং সেই সময়ে বদ্ধ কলুষিত রক্ত-গুলি পুঁজ হয়ে পড়ে, আর সেই পুঁজ সুদ্ধ কীট সকলকে শরীরের বাহিরে তাড়াইবার জন্য ভাল রক্ত প্রবাহ ঐ সব স্থানে আঘাত করে, তাতেই ঐ সকল খোস প্রভৃতি টাটায়, ঝন্ ঝন্ কট্‌কট করে, যতক্ষণ ঐ বিকৃত রক্ত এবং কীট সকলকে শরীর হতে বার না করে, এবং ভাল করে নূতন শরীর অথবা সেই মাংস প্রস্তুত না করে ততক্ষণ রক্ত প্রবাহ আপনাদের কার্য্যে নিরস্ত হয় না। এখন বলদেখি, এসকল কি পরমাণুর কার্য্য বা শক্তি নহে?

দ। তোমাকে কে বলিতেছে, যে পরমাণুর শক্তি নাই, পরমাণুতে প্রকৃতি নাই? জগৎ সংসারে সকল ভৌতিক পদার্থই তো ভৌতিক জগতের উপাদান; কিন্তু ঐ পরমাণুকে উপাদান করে ঈশ্বরের অচিন্ত্য অসীম জ্ঞানময়ী শক্তির দ্বারাই জগতের সকল জীব জন্তু স্থাবর প্রভৃতির ভবিষ্যৎ অনিষ্ট আশঙ্কা নিবারণ দ্বারা এই কৌশলপূর্ণ জগৎ এবং স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি হয়েছে, এইটাই তো বলা হল! পরমাণু সজাতীয় পরমাণুকে গ্রহণ করিবে, বিজাতীয় পরমাণুকে তাড়াইয়া দিবে এবং দিবার চেষ্টা করিবে, এতো জড়ের অন্ধশক্তির কার্য্যই; ওতে আর উল্টা কি বেসি প্রমাণ হইল?

(২) আমার অনুমান।

মা। তা বল, আমিও একটী বেস উদাহরণ জানি, এই যে গাছ পালা জন্মায়, তাহাদেরও মধ্যে স্ত্রী পুরুষ জাতি আছে; পুরুষ জাতীয় ফুলের পরমাণু স্ত্রী জাতীয় ফুলের গর্ভকোষে পতিত হইলে তবে তাতে বীচী উৎপন্ন হয়, তা না হলে ফুল শুষ্ক হয়ে যায়। এরূপ যখন স্পষ্ট দেখতে পাইতেছি, তখন কেবলমাত্র আ-শক্তি বিশিষ্ট পরমাণুর আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা কেমন করে এই সকল স্ত্রী পুরুষ জাতি উৎপন্ন হতে পারে? ভাবী অনিষ্ট নিবারণের উপায় ঐ সকল বীচির মধ্যে এবং ফুলের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়; বীচী পাছে পচে যায়, পাছে নষ্ট হয় সেই আশঙ্কা নিবারণ জন্য যতই উপায় সকল ঐ সব ফুল এবং বীচীতে হইয়াছে; এই সকল দেখে জ্ঞান সম্পন্ন স্রষ্টা আছেন স্পষ্টই মানিতে হয়।

স। ফুলের গর্ভকোষ কি? ফুলের আবার স্ত্রী পুরুষ, ছেনা পোনা হয় নাকি?

মা। তা হয়ে থাকে তাওকি জান না? গাছপালা আর আপনা আপনি চেষ্টা করে ছানাপোনা উৎপাদন করে না; ভগমানের এমনি কৌশল বাতাসে পুরুষ ফুলের পরমাণু স্ত্রী ফুলের গর্ভস্থানে উড়াইয়া ফেলে দেয় কিম্বা, ভ্রমর প্রজাপতি মৌমাছি অথবা অপর জলচর কীট পুরুষ ফুলেবসে, তাদের পরমাণু গায়ে মেখে স্ত্রীফুলে বসিলেই সেই তাদের গায়ে যে গুঁড়ালেগে থাকে, সেই গুঁড়া (পরমাণু) স্ত্রী ফুলের গর্ভস্থানে পড়িলেই তা থেকে বীচি উৎপন্ন হয়।

স। ও বাবা! শুনে যে পেটের পীলে চমকে উঠে! গাছপালার আবার গর্ভ? এই শুনি এই কবে যে হিমালয়ের ছানা হয়েছে! ঝাঁকার প্রসব বেদনা হয়েছে! কেদারার সাধ হবে, টেবিলের মার বাপের শ্রাদ্ধ হবে, ঘোটীর পাঁচুটেতেও হয়তো নিমন্ত্রণে যেতে হবে।

জীবোদ্ভিদ্ পরিবর্ত্তন প্রকরণ।

মায়া। আচ্ছা, দয়া! অনেক পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন যে, ক্রমে পরমাণু থেকে উদ্ভিদ হয়, আবার উদ্ভিদ অর্থাৎ গাছপালা পাতা, লতা পচে, তা থেকে, স্বেদজ, অর্থাৎ বিছা, জোঁক, মোসা, প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল উৎপন্ন হয়ে থাকে; তারপরে পরিবর্ত্তন হয়ে, চিংড়িমাছ প্রজাপতি প্রভৃতি অণ্ডজ জাতীয় জীব, উৎপন্ন হয়, ক্রমে ক্রমে নানা জরায়ুজ জীব উৎপন্ন হয়েছে; তারপরে ক্রমে বানর এবং মানুষ এক বংশীয় জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তা, একথায়, কি জবাব দাও দেখি?

দয়া। ও কথা আর নূতন মত কি? আমাদের ভারত বর্ষের প্রাচীন ঋষিরাও ওরূপ চিন্তা কর্‌তে বাকি রাখেন নাই, তাঁরাতো বলেগেছেন, এবং এরূপ মতের প্রবাদও আছে যে চরশী লক্ষ জীবের গর্ভ পরিভ্রমণ করে; তার পরে মনুষ্য জন্ম হয়ে থাকে; আর বিলাতী ডারউইন সাহেব প্রভৃতিরাও এখন তাহাই প্রমাণ কর্‌তে নানা রূপ অনুসন্ধান কর্‌ছেন; আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মতে এবং প্রবাদ বাক্যের হিসাবে, পৃথিবীতে চরশীলক্ষ জীব; আর এখন কার বিলাতী পণ্ডিত ইস্‌বোণ্টের মতে তিন লক্ষ বিশহাজার জাতীয় জীব, এবং কুড়িলক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ অর্থাৎ গাছ পালা, শাক শোব্‌জী ঝাঁজি পাটা প্রভৃতি; আর ঐ দুই জাতীয় জীব যাহা পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ হয়ে গেছে, তাহা সমেৎ ধরিতে গেলে প্রায় এক কোটি জাতীয় জীব হতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের হিসাবের সহিত এই হিসাবের বড় বেসি বিভিন্নতা দেখা যায় না; তখন কার তাঁরা উদ্ভিদকে জীব বলিতেন, এবং তাথেকে মানুষ হতে পারে তাওতো, অনেক স্থানে বলেগেছেন;

তা, ঐ সম্বন্ধে তখন কার মতও যেমন অবিশ্বাসের যোগ্য,—এখনও সেই রূপ অবিশ্বাসের যোগ্য কেনই না হইবে?

মা। তা বল, এই তো আমরা স্পষ্ট জানিতে পারছি, জলে শ্যাওলা পচে, চিংড়ি মাছ, মোশা প্রভৃতি হয়ে থাকে; জঞ্জাল পচে বিছে প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, গুটি পোকা থেকে প্রজাপতি হয়, পিঁপীড়া, উইপোকার পালক হয়; বাঁদর হনুমান প্রভৃতির বুদ্ধির সহিত মানুষের বুদ্ধির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। যেখানে নদী নালার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই এমন উচ্চ স্থানে ইঁদারা প্রভৃতিতে চিংড়িমাছ হয় কেমন করে?

দ। তোমাকে আমি ঐ কয়েকটীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি; চিংড়িমাচ, বর্ষাকালে জলের ধারের ঝাড়ি ঝুড়ি গাছ এবং গাছের শিকড়ে ডিম ছাড়ে তা জান? গ্রীষ্মকালে যখন জল শুকয়ে যায়, তখন সেই সরু-সরু ডিমগুলা শুক্‌য়ে যায়, তাও দেখেছ? আবার বর্ষার আরম্ভে যখন ঝড় ঝপটি হতে থাকে, সেই সময়ে ধুলার সঙ্গে সেই শুক্‌না এবং ক্ষুদে ক্ষুদে ডিম গুলা, বাতাসের সঙ্গে উড়ে উড়ে দেশ দেশান্তরে চলে যায়, এবং তার পরে যখন বৃষ্টি হয়, সেই সময়ে বৃষ্টির সঙ্গে সেই শুক্‌না ডিমগুলা, আকাশ থেকে, পড়ে যায়, যেখানে যেখানে পাত্‌কো ইঁদারা আছে. এমন কি পাহাড়ের উপরে যেখানে পাত্‌কো আছে, সেখানেও বৃষ্টির সঙ্গে ডিম্‌ পড়ে গিয়ে, তাতেই পাত্‌কো প্রভৃতিতেই চিংড়িমাছ জন্মিবার সম্ভাবনা। ঐ রূপেই ক্ষুদে ক্ষুদে বীচি সব বাতাসের সঙ্গে উড়ে গিয়ে অথবা পক্ষীর বিষ্ঠার সঙ্গে, দেশ দেশান্তরে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাতেও এক দ্বীপের উদ্ভিদ অন্য দ্বীপে উৎপন্ন হয়ে থাকে, জলের স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়েও ঐরূপে ডিম্‌ এবং বীজ দ্বারা উদ্ভিদ, এবং মৎস্যাদি ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হতে পারে। আর একরূপ অতি ক্ষুদে ক্ষুদে কীটাণু আছে, তাহা ঠিক বড় বিছার এবং কাঁকড়া বিছার আকৃতি, ঐ সকল কীটাণুর শরীর

বৃদ্ধি হইয়া বড় হইতে পারে, যেমন ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানের লোক দীর্ঘাকার হয়; সেই রূপ পরিবর্ত্তনকে কি বংশীয় দ্বারা পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে? ছারপোকার শুকনা ডিমে,—উকুনের শুকনা ডিমে ছানা হয় তবে কেমন করে? ঐ সকল ডিমের আবরণই শক্ত হয়ে হয়ে ভিতরে জীবনি শক্তি অনেক দিন জীবিত থাকে; আরও শুন, উই, পিপীড়ার পালক্ বাহির হয়ে রূপান্তর হয় সত্য; কিন্তু তাহা একরূপ পীড়া বিশেষ, হইতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে; সেটা তাহাদের জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যায় না; কারণ যেমন মানুষের গোদ গলগণ্ড, আব প্রভৃতি যেমন মানুষের জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যায় না; যদ্যপি তাহা স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইত তাহা হইলে তাঁদের বংশ পরম্পরায় ঐ সকল শারীরিক লক্ষণও থাকিত; সেই গুলি যেমন মনুষ্য জাতীর পীড়া বিশেষ, বলিতে হইবে, সেইরূপ উই, পিঁপীড়া প্রভৃতির পালক প্রকাশ হওয়া তাহাদের জাতীয় পীড়া স্বরূপ, ঐরূপ পালক বাহির হলে তাদের বংশ আর রক্ষা পায় না। যতদূর দেখা গেছে, তারা ঝাড়ে বংশে মরেই গিয়া থাকে, তখন তাদের পরিবর্ত্তন হয়ে অন্য জীব সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা কি? সেইরূপ এক জাতীয় জীবের প্রকৃতির বিপর্য্যয় অবস্থা ঘটিলে, সে জাতীয় জীব সমূলে নির্ব্বংশ হতে পারে; তত্রাচ তাহাদের প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিলে বংশ পরম্পরা সেই রূপ অবস্থায় থাকিবে, এমন সন্দেহ শূন্য উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আরও দেখ এই তো ঘুঘু এবং পায়রাতে যোট বেঁধে তাদের আর বাচ্চা হয় না, ঘোঁড়াতে আর গাধাতে যে অশ্বতর জন্মে থাকে সেই অশ্বতরের আর ছানা জন্মিবার যো থাকে না, এই নিয়ম দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হয় যে এক জাতির জীব হইতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়া নানা জাতীয় জীব উৎপন্ন হইবার যো নাই। এবং প্রকৃতির এমন নিয়মই নহে।

জা। কেন, তুমি জানতো শুটী পোকা থেকে, পালক বিশিষ্ট

প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ গুটিপোকার রূপ পরিবর্ত্তন হয়ে প্রজাপতি জন্মে থাকে ?

দ। গুটিপোকার জাতীয় নিয়মই সেইরূপ; গুটিপোকার পালক হইয়া প্রজাপতি হওয়াই তাহাদের পূর্ণাবস্থা; তাতে আর জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন কোথায় ? প্রথমে গুটিপোকা যখন উৎপন্ন হয়, তখন কুলাতে তাদের পাতা খেতে দেয় (১) দিন তারা পাতা খায়, তার পর দিনের মধ্যেই তারা গুটি বাঁধিয়া ফেলে দিনের দিন গুটির ভিতরে তাদের পালক হইয়া মুখদিয়া ঐ গুটির সূতা ঠেলে ঠেলে সরায়ে একটি গর্ত্ত করে বাহির হইয়া পড়ে। গুটির বাহির হইয়া তারা কিছুই খায় না, মেদি মদ্দা একত্র হইয়াই ডিম পাড়তে থাকে, এমন কি একেবারে, তার পরই অঘোর হইয়া পড়ে দুদিনের মধ্যেই তারা পচিয়া গলিয়া মরে যায়; ঐরূপ অবস্থান্তর কে কি কখন জাতীয় পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে ? যদ্যপি গুটিপোকা রূপান্তর হইয়া পালক বিশিষ্ট প্রজাপতি হইয়া, ঐ পালক বিশিষ্ট প্রজাপতি পুনরায় পালক বিশিষ্ট প্রজাপতি প্রসব করিতে পারিত, আর সেই সব পালক বিশিষ্ট প্রজাপতির বংশ রক্ষা পাইত, তাহলে জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন স্বীকার হইত তা যখন দেখা যায় না, তখন ঐরূপ পরিবর্ত্তনকে জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন কেমন করে বলা যাইবে ? অন্য জাতীয় প্রজাপতি সোণাপোকার ডিম প্রসব করে,—তাহারাও রূপান্তর হইয়া ঐ পালক বিশিষ্ট প্রজাপতি হইয়া পড়ে; তখন প্রজাপতি, অথবা গুটিপোকার উৎপত্তি, এবং পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তির নিয়মই ঐরূপ, এই বলা যায়।

মা। তা বল, আমিও একটী বেশ উদারণ পেয়েছি। কিন্তু তা যে বল্‌তে লজ্জা করে ?

---

(১) স্বয়ং কোন প্রেরিত রেসমের কুঠিতে উপস্থিত হইয়া গুটিপোকা যেরূপে যে নিয়মে প্রজাপতি হয় তাহার অনুসন্ধান করিতে উল্লিখিত নিয়ম অবগত হইয়াছি।

দ। লজ্জাহীন হতে আমি বলিতে পারি না; স্ত্রীলোক বেহায়া হয়ে, লেখা পড়ার আলোচনা করা অপেক্ষা চিরকাল লজ্জা রক্ষা করে যদি মূর্খ হইয়া থাকে সেও ভাল। স্ত্রীলোকের লজ্জাই সৌন্দর্য্য, লজ্জাই ভূষণ; লজ্জাই স্ত্রীলোকের জীবন অপেক্ষাও আদরের ধন।

স। সাপও না মরে—লাঠিও না ভাংয়ে,—এমন করে বলই না। তাই ভাল, আচ্ছা, বন! আমি এক খানি ডাক্তারি কেতাবে ছবি দেখিছি; যে জিনিষে মানুষের জন্ম হয় (২) সেই জিনিষের সহিত বেংয়াছির ন্যায় একরূপ কীটাণু থাকে, সেই কীটাণু জরায়ুতে প্রবেশ করিলেই মানুষ জন্মে থাকে; তাহলে মানুষ সেইরূপ বেংয়াছি পরিবর্ত্তন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ কেন বলা না যায়?

দ। তা তুমি যা বল্‌ছ তাহা নহে, ভাল ডাক্তারগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাহাতে জীবত্ব নাই, সেই সব পদার্থের তাড়না শক্তিই আছে, ডিম্বকোষকে তাড়না করে—বলেই ক্ষুদে ক্ষুদে ডিম্ব গুলি বাড়িয়া আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তা যাহউক তোমার যুক্তিকেও তুমি রক্ষা করিতে পার না; তার একটী ভারি সুন্দর যুক্তিও আছে; সেইরূপ কীটাণু হইতে মানুষ উৎপন্নকে যেমন জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে না, সেই কীটাণু অবস্থা হইতে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন বার্দ্ধক্য দশা হওয়া পর্য্যন্ত যেমন মানুষের পূর্ণাবস্থা বলা যায়, গুটিপোকা হইতে প্রজাপতি হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে সেরূপ পূর্ণাবস্থা বলা যাইবে। ঐ কীটাণু রক্তের সহিত যোগে যেমন মানুষ উৎপত্তির নিয়ম মঙ্গলময় করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার নিয়মেই গুটিপোকার প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থা প্রজাপতি হওয়ার নিয়ম দেখা যায়। কীটাণ অবস্থা হইতে মানুষের বার্দ্ধক্য অবস্থা পর্য্যন্ত যেমন মানুষের জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে না; সেই রূপ গুটি পোকার প্রথমাবস্থা হইতে

(২) Spermatozoa.

প্রজাপতি হওয়ার পূর্ণাবস্থাকেও জাতীয় স্থায়ীপরিবর্ত্তন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; ওরূপ দুই নিয়ম এক বিধ দেখা যায়; এমত স্থলে তোমার ঐ যুক্তি সঙ্গত হয় না।

মা। তা বন!—তোমার এই কথাতে আমার একটী গম্ভীর চিন্তার বিষয় মনে উদয় হল'। গুটিপোকা যে রূপ নিয়মে গুটি প্রস্তুত করে, আমারত বোধ হয়, জরায়ুতে ঐ বেংয়াছির মতন কীটাণু উপস্থিত হইয়া রক্তের মধ্যে পড়ে রক্তকে টেনে টেনে জমাইয়া গুটির সদৃশ এই শরীরকে প্রস্তুত করে, যেমন গুটিপোকার মধ্যে গুটি নির্ম্মাণের শক্তি আছে, আপনাদের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য শরীর সংগঠন—আবশ্যকীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংগঠনের শক্তি অথবা প্রকৃতি নিহিত আছে; তা যা হোক্‌গে এ সম্বন্ধে অপর একটী ক্ষুদ্র বই লিখিবার আমার ইচ্ছা রহিল।

দ। সেই ভাল; এক বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিবার সময় অন্য বিষয় উল্লেখ না করাই ভাল। একরূপ জীবের স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয়ে ভিন্ন জাতি জীব হতে পারে, সে পক্ষের তোমার আর্ কোন প্রমাণ আছে কি?

মা। কেন? এই তো চক্ষের আঁকে দেখা যায়, এবৎসর যাহা একমটে ফুল আছে,—এবৎসর যাহা এক্ থাক্ পাক্‌ড়ি অপরাজিত আছে, সেই ফুলের বীচীতেই ফিরে বৎসরে সব দোমটি এবং অনেক দল বিশিষ্ট (পদ্ম) অপরাজিতা হয়ে যায়; এবং যাহা এবৎসর পদ্ম অপরাজিতা আছে বা অনেক দল বিশিষ্ট দোমটি ফুল আছে, ফিরে বৎসরে হয় তো তাহার বীচীতে একটে ফুল হয়ে পড়ে। একে কি পরিবর্ত্তন বলা যায় না?

দ। তুমি জান, রোগা ভাংড়া পুরুষ এবং স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র জন্মায়, তা প্রায়ই রোগা চল্লাই হয়ে থাকে? এও সেইরূপ জেন। যে গাছের বীচী পুরাতন, এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, সেই সকল

বীচীর চারাতে যে ফুল হয়, তাহা একটে হয়ে যায় ; এবং যে সকল বীচী নূতন এবং সতেজ, তাহার চারার ফুল (পদ্ম) অর্থাৎ অনেক দল বিশিষ্ট হয়ে যেতে পারে ; সেই জন্য পুরাতন বীচীর ফুল একটে হয়, আবার সেই একটে ফুলের সতেজ বীচী, সতেজ জমিতে পড়িলে (পদ্ম) অর্থাৎ অনেক দল বিশিষ্ট ফুল উৎপন্ন হতে পারে ; তাকে কি জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে ? এই যে ইয়ুরোপে অগ্রে ময়ূর ছিল না তার পরে ভারতবর্ষ হতে ময়ুর নিয়ে গিয়ে ইয়ুরোপের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হলে, ক্রমশঃই তাদের বংশের রং শাদা ধপ্ ধপে হয়ে গেছে ; তাদৃশ পরিবর্ত্তনকে কি জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাইবে ? এই যে বেদিয়া জাতীয়া ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপ এবং এমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বংশ পুরম্পরায় বাস করিয়া তাদের রং হুদে সিঁদুরে হয়ে গেছে তাতে কি জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাইবে ? (১) জেব্রা হইতে ঘোঁড়া উৎপন্নকেও অসঙ্গত রূপে স্বীকার করিতে হইলেও ও সকল জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন কিছুই নহে, যদ্যপি আঁবগাছে বেল ফলিত এবং সেই বেলের চারাতে আবার বেল হইত, তাহলে তাহাকেই জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যায়। সেরূপ জীবের পরিবর্ত্তন কোথায় দেখা যায় ? পাতা পচে মশা হয়, না পাতা পচা স্থানে মশা প্রভৃতির উৎপত্তি হয় ? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি আছে ? সেই জলেতে কীটাণু স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম জীবনি শক্তিকে ঈশ্বরের সৃষ্টি কারিণী শক্তি-প্রকৃতি প্রেরণ করিতে কি পারেন না ? পাতালতা পচে মশা প্রভৃতি জন্তু হয়, এবং পচা স্থানে মশা প্রভৃতি জীব জন্মে থাকে, এই দুই কথার অত্যান্ত ভিন্ন অর্থ তা বুঝ্তে পেরেছ ?

মা। তাও যদি না পারিব, তবে আর আমার সঙ্গে তুমি এত

---

(১) ঘোঁড়ার মতন অনেকটা সাদৃশ্য আছে এমন জন্তু বিশেষ।

কথা কহিছ কেন? আচ্ছা, বল দেখি, এইযে, ঘুকুতে আর পায়রাতে যোট বেঁদিয়ে তা থেকে একরূপ ছানা হতেছে, গাধাতে আর ঘোঁড়াতে, অশ্বতর হতেছে, এ সকল কি জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাবে না?

দ। আচ্ছা বল দেখি, ঘুকুতে আর পায়রাতে যে বাচ্ছা হয়, তাহারা ঠিক্ ঘুকুর মতন ডাকে কিনা? তাদের প্রকৃতি পিতৃকুল মাতৃকুল ছাড়া কিনা? অশ্বতরেরও সেই রূপ প্রকৃতি পিতৃকুল, মাতৃকুল ছাড়া কি? কুকুর আর নেক্‌ড়ে বাঘে অথবা পায়রাতে আর ঘুকুতে যে বাচ্ছা হয়, গাধাতে আর ঘোঁড়াতে যে ছানা হয়, সেই অশ্বতর বা ঘুকু পায়রার উৎপত্তি যে ছানা তাহাদের আর ছানা বা বাচ্ছা জন্মাতে পারে কি না?

মা। তা কেন হবে? তারা ঠিক্ ঘুকুর মতন ডাকে; অশ্বতর গুলির পিতৃকুলে সাদৃশ প্রকৃতি বৈকি?

দ। তবে বল দেখি, বানর থেকে যদ্যপি মানুষ উৎপত্তি হইত, অথবা এক মূল জাতি থেকে যদি বানর আর মানুষ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সহোদর ভেঁয়ের বংশের কথা বার্ত্তার এত ভিন্নভাব হইবার কারণ ছিল কি? মাতৃকুল এবং পিতৃকুলের সদৃশ বাক্য, এবং বুদ্ধির কার্য্য এবং আকৃতি গত সাদৃশ্য, জ্ঞানগত সাদৃশ্য না থাক্‌বার হেতু কি? ঐ তো উল্লিখিত দুটী জাতীয় জীবের উদাহরণ যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহাদের যখন মাতৃকুল পিতৃকুল গত শব্দ এবং লক্ষণ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই দেখা যায়, তখন বানর এবং মানুষ সহোদরভ্রাতা হইলে কিম্বা মানুষ সকল বানর কূল থেকে উৎপন্ন হলে, একেবারে বাক্যের এবং জ্ঞানের এবং শরীরের সকল প্রকার আসল বিষয়ের সাদৃশ্য একেবারে লোপ হইবার সম্ভাবনা কি?

মা। কেন সদৃশ্য থাক্‌বে না? আর মানুষের হাত্ পা প্রভৃতির

সঙ্গে, এবং বানরের হাত্ পা প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গের বিলক্ষণ সদৃশ্য আছেতো? জ্ঞানের সাদৃশ্য কি কিছুই নাই?

দ। হাত্ প্যর সাদৃশ্য তো থাক্‌লে হবে না? মাথার সঙ্গে সাদৃশ্য কত তফাৎ তা একটী ভাল জাতীয় প্রাচীন কালের বানরের মাথা, এবং পূরাকালের আদিম মানুষের মাথা, যাহা এখন প্রস্তর তুল্য হইয়া রহিয়াছে, তাহার যে সব ছবি এখন দেখিতে পাওয়া যায়, তা থেকে মিল্‌য়ে দেখ দেখি (১) তাহলে বেস দেখিতে পাইবে যে, বানর জাতির শারীরিক সাদৃশ্যের সহিত আর মনুষ্য জাতির উত্তমাঙ্গ প্রভৃতির কতদূর ইতর বিশেষ তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া যাইবে। জ্ঞানের সাদৃশ্যের আর কথায় কায কি? সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আগুণ জ্বালা, রান্না বাড়না করা, ঘর দ্বার স্কুল প্রভৃতি প্রস্তুত করা, অন্যের স্বার্থ রক্ষা জন্য চেষ্টা করা, খবরের কাগজ লেখা, এ সকলই তো বানর হনুমানের দ্বারা হয়ে থাকে, তা কি দেখ্‌তে এখন পাওয়া যায়?

মা। তা বল, আমি ও একটী ও পক্ষে বেস কথা জানি; এই আমাদের নিকটেই ত্রিহুট্ জেলার অন্তর্গত, গণ্ডক নদীর তীরে মতীহারী নামক স্থানে প্রায় সমস্ত নর নারীর গলগণ্ড আছে, সে দেশী লোকে, অন্য বাঙ্গালীকে দেখিলে বলে "বাঙ্গালীরা বেস্ সুন্দর কিন্তু তেনি ঘেগ নাই, অর্থাৎ অমন গলগণ্ড থাক্‌লেই বেস্ সুন্দর হইত" এমন গলগণ্ড থাকা মানুষের কি, স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাইবে? ও তো জল হাওয়ার গুণে দেশ শুদ্ধ লোকের ঐরোগ হইয়া থাকে, তাই বলে ওটা কি স্থায়ী পরিবর্ত্তন? সেইরূপ পিঁপিড়ার পালক, হওয়াও যৌগ বিশেষ; তাহাকে আর জাতীয় স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা যাবে কেমন করে?

দী। বলি ও মায়া! ও কথাটিতে কিছুই যে খুজে পাওয়া যায় না, এমনও নয়; "বানর থেকেই মানুষ হয়েছে" একথার কি কিছুই

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ন্যায় শাস্ত্র ঘটিত অর্থ নাই? যেমন "গোরু জীব, মানুষ ও জীব, অতএব গোরু মানুষ" এরূপ স্থলে যেমন "মানুষ কতকগুলিন জীব" ধরে নিতে হয়, সেইরূপ "কতকগুলি মানুষ বানর", এরূপ কেনই না বলা যাবে? যদি মানুষ বাঁদরই না হবে—তা হলে এরূপ মত প্রচারই বা কেন হইবে এবং ঐরূপ মত গ্রাহ্যই বা কেন হইবে?

দ। ছি! ছি! তুমি কি কটূ না বলে থাক্‌তে পার না? ডারউইন্, হক্‌সেলি, কি কম্ লোক মনে কর? তাঁদের মত পণ্ডিতকে কোথায় ভক্তি করা উচিত, না, কটূ বাক্য? মতের ভুল থাক্‌লেই যে লোক অন্যকে কটূ বলেন, তিনি আপনারই ঘৃণিত রুচির পরিচয় প্রদান করেন।

মা। বলি স্বরস্বতি! কৈ তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করে দেখ?

স। তার পরে তুমি যদি আমাকে আঁচ্‌ড়ে নাও তা হলে তোমার কর্‌ব কি? তোমাদের জেতের যুক্তি তো আঁচড় কামড়ই সার। তোমরা হলে এক জাতীয় জীব, আমরা হলুম মানুষ, ভিন্ন জাতীয় জীব, আমাদের কথা তোমারা বুঝ্‌তেই বা পারবে কেমন করে? তোমাদের জেতের জ্বালায় সব নাউ কুমড়োর বাজার অগ্নি মূল্য হয়ে উড়্‌তে বসেছে! দাঁল্লা দিয়ে যে দুগাল ভাত্ মুখে দিব, তারতো যো নাই? সব ডগাই যে কেটে খেয়ে ফেল্লে? বলি ও পূর্ব্ব জন্মের অঞ্জনা! বলি, আমার মাথার উকুন বেছে দিতে পার কি? বলি আজ কাল কাশীর দুর্গাবাড়ীতে ছোলা ভাজার আমদানি কেমন তা বল?

মা। হা!—জেঠাই বুড়ী! ঠিক্ যেন বাক্যির জাহাজ! পেটে এতোও ঠাট্টা আছে?

মা। তা সত্যিই বল! এই যে নারীকেল গাছ আর তাল গাছ লম্বাতে আকৃতি গত প্রায় একই রূপ, উভয় প্রকার গাছের ভিতরের চোঁচ, এবং সার হওয়া, বাল্‌তো ছাড়ার নিয়ম একই রূপ; ফলের মধ্যে শাঁস হওয়া, ফলের মধ্যে জল সঞ্চার একই রূপ; (তবে বেসি কম আছে) তালের আঁটিতে কোঁপল হয়,—নারীকেলেও কোঁপল

হয়,—ঝুনো হলে তালের আঁটি আর নারীকেলের মালা একই রূপ শক্ত হয়ে থাকে, ঐ দুই ফলের ফোঁপল হয়ে একই প্রকার নিয়মে কলা বাহির হইয়া গাছ জন্মায়, শীকড়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রায় একই প্রকার; তাহলে নারীকেল আর তাল গাছ কি একই মূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলা যাইবে? যেমন আকৃতি গত সাদৃশ্য অনেকটা মিল থাকিলেও নারীকেল আর তাল গাছ ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ স্পষ্টই জানা যায়, সেইরূপ বানর, আর মানুষের আকৃতিগত, এবং জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির সদৃশগত অনেকটা ঐক্য থাকিলেও, এই দুই জাতীয় জীব যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। তাতো ঠিকই উদাহরণ বলেছ। আরও শুন;—যখন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পষ্ট প্রমাণ করেছেন, যে সোণা, রূপা, তাঁবা, লোহা, পাথুরে কয়লা, হরিতাল, গন্ধক, পারা প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার ভূত ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু,—ঐ সকল ভূতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি হইয়াছে, তখন জগতের জীব সকলও যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি কেনই না স্বীকার করা যাইবে? যেমন ঈশ্বরের মঙ্গলময় প্রকৃতির অথবা শক্তি কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁর মঙ্গল নিয়ম দ্বারা জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে সেইরূপ তাঁরই নিয়ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জীবও উৎপন্ন হইতেছে ইহা কেনই না বলা যাইবে?

স। বলি মায়া! আমি একটা নূতন আবিষ্কার করেছি, তা শুন, হাতীর শুঁড় লম্বা, মশার হুলও লম্বা, আর চিংড়িমাছের শুংওত সরু এবং লম্বা, আর মানুষের গোঁপের আগাও লম্বা, অতএব যখন এই কটী জীবের অঙ্গের সাদৃশ্য একই রূপের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে, তখন এই এই কয়েকটী জীবই যে এক জাতীয় তা কি প্রমাণ হইতেছে না? মশা থেকে হাতী হয়েছে, এবং হাতী থেকেই চিংড়ি মাছ হয়েছে, আর চিংড়ি মাছ থেকেই গুঁপো দেড়ে জামা যোড়া পরা মানুষ, এবং তোমার মতন লম্বা চুলো স্ত্রীলোক সকল হয়েছে, এটী কি যুক্তিতে অসোত্ত পারে না? আচ্ছা, [illegible]! দুম্বো, ভেড়ার পেছন 'দিগটা' ফুলো,

বেতো রোগী মানুষদেরও তো গোদ প্রভৃতি নানা স্থান ফুলো হয়ে থাকে, তাই বলে বেতো রোগী মানুষ মরে, অথবা পরিবর্ত্তন হয়ে ছুঁচো ভেড়া হয়েছে এটীও কি অনুসঙ্গিত হয় না? আচ্ছা বন! বিরক্ত হইও না, আমি সবই যে তামাসা করি, তা কেন? এই যে (গিনি ওয়ারম্) বলে, প্রায় চল্লিস্ ইঞ্চি লম্বা সাপের মতন মুখ, একরূপ পোকা মানুষের শরীরের মধ্যে অথবা পেটে জন্মে থাকে, তাহলে, ঐ থেকেই সাপ্ হয়েছে, এরূপ কেন না বলা যাবে? মানুষ যত খলতা জানে, সাপে তার চেয়ে বেশি জানে কি? তা হলে "বাপ্‌কা বেটা সিপাহীকা ঘোঁড়া" ঠিক মানুষের ছানার উপযুক্তই সাপ, ঐ (গিনি ওয়ারম) থেকে ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েছে এটী কেন না বলা যেতে পারে? বোধ করি ঐ পোকা যার শরীরে অথবা পেটে জন্মিত, সেই "সাপ প্রসব করেছে" এইটীই লোকে বল্‌ত, না? গিনি ওয়ারম্ শরীরে অথবা পেটে জন্মিলেও মানুষের বাঁচা তো কঠিন, আর যাঁর সাপ প্রসব করন, শুনিছি, তাঁরাও তো বাঁচ্‌তে শুনিনি? তা, এরূপ পরিবর্ত্তন কেনই না বলা যাবে?

দ। তামাসা ছাড়, পরিবর্ত্তন না হবে কেন? বরং পরিবর্ত্তন হতে পারে;—রোগা এবং বলিষ্ঠ, এরূপ পরিবর্ত্তন হতে পারে; কিন্তু জাতীয় শারীরিক পরিবর্ত্তন, জাতীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, অথবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে কোন রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায় না; স্থায়ী পরিবর্ত্তন হতে গেলে একেবারে জাতীয় জীব ধ্বংশ হইবার প্রমাণ, উইর পীপিড়ার পালক উঠ্‌বার সময়ে যেরূপ ঘটনা হয়ে থাকে, সেইটী দেখলেই যথেষ্ট প্রমাণ হইতে পারে।

আদিম অবস্থা প্রকরণ।

ম। আচ্ছা, দয়া! বল দেখি,—ধর্ম্মের মূল তো বিশ্বাস? কিন্তু বিশ্বাস তো আর চিরস্থায়ী বৃত্তি নয়? বিশ্বাস, এই আছে, এই নাই;

তথন ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরে লোকের চিরকাল বিশ্বাস ছিল, তার প্রমাণ কি ? যখন আদিমকালে মনুষ্য জাতি বাঁদরের মতন উলঙ্গ থাক্‌ত, এমন অসভ্য ছিল, তথন তাঁদের ধর্ম্মে বা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ছিল একথা কেমন করে স্বীকার করা যাইবে ? আদিম মানুষের ইতিহাস পড়ে জানা যায়, প্রথমে তাঁরা পশুর মত পর্ব্বতের গহ্বরে বাস কর্‌তেন, আর পশু মেরে কাঁচা মাংস খেতেন, তথন কি তাঁদের জ্ঞান ছিল ? না ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল ? তার পরে একটু সভ্য যথন হন, তখন, ঝড়, বৃষ্টি আগুন প্রভৃতির বড়ই শক্তি আছে জেনে, দেখে, ঐ সকলকে দেবতা বলে মনে কর্‌তেন এবং বিশ্বাস করৃতেন; তারপরে কত হাজার হাজার বর্ষ পরে যখন একটু সভ্য হয়, তথন দেবতা পূজা, হোম প্রভৃতি আরম্ভ করেন, তাতেই তাঁদের বিশ্বাস উপস্থিত হয়। তারপরে যখন মানুষ ভাল সভ্য হল, এবং জ্ঞান বেস বাড়িল, তখন মানুষ, জড় শক্তির উপাসনা ছেড়ে, নিরাকার সত্য স্বরূপের ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তারপরে আরও জ্ঞান বেসি বৃদ্ধি হলে, ঈশ্বর নাই, কেবল প্রকৃতি অথবা স্বভাব আছে, এই বিশ্বাস উপস্থিত হয়, সেই দুই বিশ্বাস এখন জগতে মনুষ্য সমাজে চলিতেছে ; তখন বিশ্বাসের স্থায়িত্ব কোথায় ?

দ। আদিম কালের সেই উলঙ্গ মানুষরা এই আকাশ এবং পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুকে এবং তাঁদের নিজের নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করৃতেন কি না বল দেখি ?

মা। তা বিশ্বাস না করে বাঁচিবার যো ছিল কি ?

দ। তবে “বিশ্বাস” একটী মনুষ্য আত্মার সঙ্গের সঙ্গী, এবং মানব আত্মার একটী অঙ্গ, সেটীতে কি সংশয় আছে ?

মা। হাঁ তা ঠিক কথাই তো।

দ। আচ্ছা, সেই আদিম কালের অসভ্য উলঙ্গ মানুষদের জ্ঞান, বুদ্ধি, আদৌ ছিল না তার প্রমাণ কি ? তাঁরা তখন পর্ব্বতের গুহাতে থাকৃতেন সত্য, কিন্তু হিংস্র জন্তুর হাতু থেকে রক্ষা পাইবার জন্য

পাথরের কত রকম অস্ত্র প্রস্তুত কর্‌তেন, এখনও সেই সব পাথরের অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে, তখন তাঁদের কোন জ্ঞান ছিল না, এটা কেমন করে প্রতিপন্ন হতে পারে? বিবর প্রভৃতি পশুকে বাড়ী ঘর প্রস্তুত কর্‌তে পারে সত্য, কিন্তু অন্য জন্তুর হস্ত হইতে আপনাদের জীবন রক্ষা কর্‌বার জন্য অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত কর্‌তে পারে কি? বানররা, মানুষের খুব ঘনিষ্ট প্রতিবাসী সত্য, কিন্তু তারা কখন আগুণ জ্বালিয়া ভাত্ রাঁধা, অথবা মাংস পুড়াইয়া খেতে পারে কি? তাহলে সেই ঘোর অসভ্য অবস্থাতেও সেই উলঙ্গ মনুষ্য জাতির জ্ঞান,—বুদ্ধি, বিশ্বাস ছিল, তার প্রমাণ হতেছে না? তাঁরা, আপনা অপেক্ষা শক্তিমান্ পদার্থকে পূজা বা আরাধনা কর্‌তেন তাতে তাঁদের মধ্যে একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভাব ছিল এর কি প্রমাণ হয় না? কৈ বানর, বিবর হাতী সিংহ খেঁক্‌শালী, অথবা অপর কোন জীবের মধ্যে সেরূপ ভাব কি প্রত্যক্ষ হয়! তাঁদের আত্মার মধ্যে ধর্ম্ম বিশ্বাস যদি না থাক্‌তো, তাহলে অপর শক্তিকে পূজার বিশ্বাসটী কেমন করে আস্‌তে পারতো?

মা। তা, তা, তাই বলি;——

দ। আচ্ছা বল দেখি,—যে স্থানের মাটির মধ্যে সোণা রূপা তাঁবা, লোহা, পারা, গন্ধক হরিতাল, সিসা প্রভৃতি ধাতুর পরমাণু মিশনা না থাকে, সেই স্থানের মাটিকে সহস্র গালাই কর্‌লে, ঐ সকল ধাতুর এক্ ছিটে ফোঁটা বার হতে পারে কি?

মা। তা কেমন করে পাওয়া যাবে?

দ। যে স্থানের মাটিতে সোণার পরমাণু মিশ্রিত না থাকে সে স্থানের মাটিকে সহস্র গলাই কর্‌লে, যেমন তা থেকে এক ছিটে ফোঁটাও সোণা বাহির হইতে পারে না,—কাঁচকে সহস্র গলাই কর্‌লে যেমন তা থেকে চিনি বাহির হতে পারে না; পাথরকে সহস্র রূপান্তর কর্‌লেও যেমন তা থেকে গোলাপ জল বা আতর বার হতে পারে না; সেইরূপ আদিম অসভ্য সেই উলঙ্গ মানুষ জাতির মধ্যে যা একেবারে

না ছিল, তেমন কোন শারীরিক অথবা মানসিক উপাদান বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী মনুষ্য জাতির নাই। তাহলে পরিবর্ত্তন দ্বারা কাঁচেতে চিনি উৎপন্ন, সোণাতে গোলাপ জল উৎপন্ন হতে পারতো। সেই অসভ্য অল্প বুদ্ধি উলঙ্গ আদিম মনুষ্যদিগের জড় শরীর যে উপাদানে সংগঠিত ছিল,—তাঁদের মন রাজ্যে যে যে প্রবৃত্তি সকল ছিল, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধি, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান ইচ্ছা ভাব প্রভৃতি অল্পাংশ মিশ্রভাবে ছিল বলেই তাঁদের বংশধর এই সভ্য জাতি মানুষে সেই সব পাইয়াছে। যথন খনিতে সোণা প্রভৃতি ধাতু থাকে, তথন লোকে যেমন ঐ মিশ্র সোণাকে সোনা বলেই চিনিতে পারে না, কিন্তু সেই বিকৃত সোণার পরমাণু মিশ্রিত মাটিকে বারম্বার গলাই কর্‌বার পরে, যথন, সোণার চ্যাক্ চাক্‌নি প্রকাশ হয়ে ওঠে তথন লোকে কি মনে করে? তথন লোকে, এই মনে করে না যে, ঐ মাটির চাপের মধ্যে সোণা মিশ্রিত ছিল বলেই, গলাই দ্বারা পরিবর্ত্তন হয়ে বিশুদ্ধ সোণা বাহির হইতেছে? অথবা ঐ মাটির চাপড়া পরিবর্ত্তন কর্‌বার সময়ে আকাশ থেকে খানিকটা সোণা এসে উপস্থিত হল, এমন করে কি?

মা। ঐ মাটিতেই সোণার পরমাণু মিশ্রিত ভাবে ছিল, এইটাই বুদ্ধিমান লোকে মনে করে।

দ। এতেও ঠিক সেই রূপ; বর্ত্তমান কালের মানুষের দুই পা, দুই চোখ, দুই কাণ, দুই হাত এক মুখ যে সব শারীরিক উপাদান দেখা যায়, এবং ঈশ্বরের ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি যে সব দেখা যায়, আদিম কালের মনুষ্যের তাই ছিল; কেবল মাত্র এই বলা যাইতে পারে তাঁদের শরীরাদি যেমন অপরিষ্কার এবং উলঙ্গ, বা পশু চর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকিত, সেইরূপ জ্ঞান বুদ্ধি, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক অংশে সঙ্কীর্ণ ছিল; তাঁদের বংশধরদের ক্রমশঃ তাহা প্রদীপ্ত হইয়া আসিতেছে, এইটাই প্রকৃত কথা বলা যায়।

মা। তা এতো এখন বেস্ বুঝ্তে পার্ছি।

দ। আচ্ছা, একজন তোমাকে এখন বলেন যদি যে, আদিম মানুষদের মাথার দিগে তিনটা পা ছিল, এবং একটীও চোখ্ ছিল না, একথা তুমি কি কোন মতেই বিশ্বাস কর্তে পার?

মা। তা কেমন করে বিশ্বাস কর্ব? তা হলে সে তো আর মানুষ হল না?

দ। তবে জ্ঞান, ভাব ইচ্ছা, বিশ্বাস প্রভৃতি না থাক্লে মানুষ হবে কেমন করে? মাথার দিগে তিনটা পা থাকার কথাও যেমন অশ্রদ্ধেয় এবং বিশ্বাসের যোগ্য নহে, সেইরূপ, জ্ঞান এবং বিশ্বাস বিহীন আত্মা থাকাও বিশ্বাস যোগ্য কথা নহে, এবং সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় কথা বলিতে না হইবে কেন? খনিজ ধাতু খনিতে বিকৃত এবং মিশ্রভাবে আছে বলে, তার থাকার অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না, এবং ক্রমিক রসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্বারা যেমন সেই সকল মিশ্র ধাতু পরিষ্কার ঝক্ ঝকে হয়ে উঠে, সেইরূপ আদিম মনুষ্যদিগের মধ্যে যে সকল মানসিক প্রবৃত্তি বা ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মভাব হিতাহিত জ্ঞান, কর্ত্তব্য জ্ঞান, ঈশ্বরের ভাব এবং বিশ্বাস প্রভৃতি যাহা বিকৃত অবস্থাতে ছিল, ক্রমশঃ বংশ পরম্পরার আলোচনা দ্বারা মার্জ্জিত এবং বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, এইটীই যুক্তি যুক্ত কথা বলা যাইতে কি বাধা আছে?

মা। তবে যাঁরা নাস্তিক, তাঁরাও তো সেই অসভ্য জাতি মানুষের বংশ ধর? তা হলে সেই আদিম মনুষ্য জাতির মধ্যে নাস্তিকতার ভাবও তো ছিল?

দ। ফের্ ঐ কটূ কথা মুখে আন? নাস্তিক কি মানুষ হতে পারে? না আছে? যেমন সোণা হাজার রূপান্তর হলেও রূপা হয়ে যেতে পারে না, তবে গিল্টী মাখিয়া থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু সোণার প্রকৃতি যেমন রূপা হইয়া যেতে পারে না, সেইরূপ মানুষ কোন মতেই সত্যেতে অবিশ্বাসী নাস্তিক হতে পারে না; তবে কোন রূপ গিল্টীর আচ্ছাদন

বাহিরে ঢাকাদিয়া মুহূর্ত্তকাল থাক্‌তে পারেন, সেটী তাঁদের স্বাধীনতা আছে, এই মাত্র বুঝা যায়।

স। দয়া! এক থাবা গরম্ গরম্ চৌবাড়ী বাঁধ, আমরা তোর পড়ো হব্ব।

আত্মা ও মস্তিষ্ক প্রকরণ।

মা। আচ্ছা, দয়া! অনেকের এরূপ মত তো আছে যে, "আত্মা" বলে একটী পৃথক কোন পদার্থ নাই; কেবল এই শরীরই সর্ব্বস্ব;— দেহ ত্যাগ হইলেই মানুষের সকলই এই খানে ফুরাইয়া যায়।

দ। তবে শরীরের মধ্যে জ্ঞান, ইচ্ছা, আশা, ভাব, মন প্রকৃতি যে সব আছে, সে সকল কি?

মা। তাঁরা বলেন,— ও সব আর কিছুই নহে, কেবল মাথার ঘী, অর্থাৎ মস্তিষ্ক হইতেই ঐ সকল বার হয়; ও সকল মস্তিষ্কের গুণ; যেমন মেঘ জমিলেই অর্থাৎ গাঢ় হইলেই, মেঘ থেকে বিদ্যুৎ হয়;— মেঘের পরমাণুতে যেমন তাড়িতের শক্তি আছে এবং আকর্ষণী শক্তি আছে বলেই মেঘের পরমাণু সকল পরস্পর একত্র হইয়া জমে যায়, একত্র জমিলেই যেমন মেঘ হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ হতে থাকে—বজ্র-ধ্বনি হতে থাকে, সেই রূপ দেহ মধ্যে মস্তিষ্কের পরমাণু একত্র হইয়া এবং পুরষ্ট অর্থাৎ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, আশা, মন প্রভৃতির কার্য্য হইতে থাকে।

দ। তা হলে, তুমি মস্তিষ্ককে কিরূপ পদার্থ বল, আর আত্মাকে বা কি পদার্থ বল্‌বে?

মা। কেন? মস্তিষ্ককে জড়পদার্থ বলিব; আর জ্ঞান, ইচ্ছা, আশা, মন প্রভৃতিকে ঐ জড়পদার্থ মস্তিষ্কের গুণ বা শক্তি কার্য্য বলিব।

দ। আচ্ছা, পৃথিবীর সৃষ্টি কালে যে সকল জড় পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে, তুমি বলিতে পার, ঐ সকল পরমাণুর কোন পরমাণু এই পৃথিবী হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে কি? কিম্বা সে সব পরমাণু এখন নাই?

মা। তাও কি কখন ফুরাইতে পারে? সৃষ্টি কালে পৃথিবীতে যত পরমাণু ছিল, তা ফুরাইবে কেন?

দ। আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে মানুষের দেহে যত প্রকার পরমাণু থাকে, ঐ সকল পরমাণু কোথায় যায়?

মা। জলের পরমাণু জলেতে যায়,—মাটির পরমাণু মাটিতে যায়, বায়ু বায়ুতে যায়, তেজ তেজেতে যায়, আকাশ আকাশে যায়; এই তো হিন্দুশাস্ত্রের মত; কিন্তু নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে, যত প্রকার পরমাণু শরীরে থাকে, তাহা এই পৃথিবীতে মিশাইয়া, ঐ সকল পরমাণু হইতে নানা প্রকার উদ্ভিদ এবং নানা প্রকার জীবদেহ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হতে থাকে। নূতন বিলাতী মতে চৌষট্টী প্রকার ভূত অর্থাৎ পরমাণু এই পৃথিবীতে আছে; ঐ সকল ভূত হতে জীবজন্তু গাছ পালা যত কিছু সৃষ্টি হতেছে আবার তাতেই গিয়ে মিশিয়ে থাকে।

দ। তবে একটী ও পরমাণু ধ্বংস হয় না?

মা। তা তো হয়ই না।

দ। এখন বল দেখি, আত্মা যদ্যপি মস্তিষ্ক প্রভৃতি জড় পদার্থের গুণই হইত, তা হলে মানুষ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল জড় উপাদানে মানুষের শরীর এবং মস্তিষ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন ও পৃথিবীতে সেই সকল জড় উপাদান আছে, সেই সকল পরমাণু, এবং তাহার রচনা নিয়ম তো বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ঐ সকল পরমাণু এবং জড় উপাদানের সংযোগে নূতন মানুষ উৎপন্ন না হয় কেন? তাহা হইলে মানুষের পেট থেকে কেবল সন্তান

উৎপন্ন না হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী ভুঁই-ফোড় ছেলে মেয়ে কেন উৎপন্ন না হইয়া থাকে? এক সময়ে জগতে মানুষের তো সৃষ্টি হয় নাই, এমন কি কোন রূপ জীবের সৃষ্টিই হয় নাই, ইহাও ভূতত্ত্ব বিদ্ এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন; তোমার মতে সায় দিতে হইলে প্রথম যে সকল মানুষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা কেবল জড়পদার্থের সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া ছিল স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সৃষ্টি কালে যদি কেবল জড়পদার্থের সংযোগে মানুষ উৎপত্তি হইয়া থাকিত, তাহলে এখন একটী ও যে সেই রূপে, কেবল মাত্র জড়পদার্থের সংযোগে মানুষ উৎপত্তি না হইবার কারণ কি? যদি এমন বল যে, সে সকল উপাদান আর পৃথিবীতে নাই, তাহাও বলিবার যো রাখ নাই, কারণ তুমি এই মাত্র বলিয়াছ শরীরে, যত প্রকার উপাদান আছে বা সৃষ্টি কালে ছিল ঐ সকল পরমাণু অদ্যাপিও পৃথিবীতে আছে,— ঐ সকল উপাদানই পৃথিবীতে আছে, তাহা হইলে, এখন মানুষের গর্ভে সন্তান না হইয়া কেন অল্প সংখ্যকেও মানুষ ঐরূপে কেবল মাত্র জড় উপাদানের সংযোগে আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না? আরও তুমি এমন কোন রূপ প্রমাণ করিতে পার কি, মানুষের শরীরস্থ জড় উপাদান যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই, বা এখন আছে, তখন ছিল না?

মা। 'বড় বড় হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল!' তা আমি জান্‌ব কেমন করে? সেই সৃষ্টি কর্ত্তাই জানেন; একি মানুষে বল্‌তে পারে?

দ। আরও একটী প্রমাণ বলিতেছি;—একই বিধ জড়ের একই প্রকার গুণ হইয়া থাকে জান তো? যেমন আগুনের প্রকাশ গুণ এবং দাহিকতা গুণ, অথবা আগুণের প্রকাশ শক্তি এবং দাহিকতা শক্তি এই উভয় বিধই আছে, কিন্তু ঐ আগুনকে সহস্র পাত্রান্তরে রাখিলেও আগুণের শৈত্যগুণ কখন হতে পারে কি? তাহা কদাচই পারে না, এটী জান তো? এবং আগুণকে লাল, নীল, সোবুজে, হল্‌দে ঝাড় লাল-

ঠন প্রভৃতির ফানসের মধ্যে রাখিলেও কেবল বাহিরের বর্ণের কিঞ্চিত্ত তফাত্ হয় বটে, নচেৎ ভিতরের দাহিকতা শক্তি এবং প্রকাশ শক্তি একই রূপ থাকে তা জান তো?

মা। তা তো সবই সত্য।

দ। তবে বল দেখি মস্তিষ্ক সহস্র ভিন্নাধারে থাকিলেও তাহার গুণ এবং শক্তি সকলের সমান ভাবে কার্য্য করা, অথবা সমান ভাবে গুণ প্রকাশ হওয়ার কি বাধা হইতে পারে?

মা। তাতো পারেই না।

দ। এখন বল দেখি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতি যদি মস্তিষ্কের গুণই বা শক্তিই হইবে, তাহলে হাতী, ঘোড়া, গাধা বানর, হনুমান, বাঘ, গোরু, বেরাল, কুকুর, প্রভৃতির মস্তিষ্কের গুণ কিম্বা শক্তি আর মনুষ্যের মস্তিষ্কের গুণ এবং শক্তি একই রূপ হইত তো? তাহলে ঐ সকল প্রকার জীবের মস্তিষ্ক হইতে জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি একই বিধ প্রকাশ হইত তো? তোমার স্মরণ আছে, পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, একই বিধ জড়ের গুণ যখন একই বিধ দেখা যায়, যখন মানুষ এবং ইতর জন্তুর মস্তিষ্কও অর্থাৎ মাথার ঘীর উপাদান সকল একই বিধ দেখা যায়, তখন তাহাদের গুণ অথবা শক্তি একই বিধ না হইবার কারণ কি?

মা। তা কেন হবে? যেমন আধার বিশেষে আলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশাতে আলো একরূপ হয়, কাঠের সঙ্গে আগুণ থাকলে আলো আর এক রূপ হয়, ঝাড় লালঠনে আলো আর এক রূপ দেখা যায়, সেই রূপ যে জন্তুর মাথার খুলির যেরূপ গঠন প্রণালী, সে জন্তুর মাথার যতটুকু বেশি ঘী থাকে, তারই কমি-বেশি অনুসারে, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ইতর বিশেষ হয়ে থাকে।

দ। তা হলে হাতীর মাথার যত বেশি ঘী থাকে, এত আর কোন

জীবের তো দেখা যায় না, তখন হাতী, সকল মানুষ অপেক্ষা বেসি জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক অথবা বুদ্ধিমান কেন হয় না?

মা। তা কেন হইবে? যদ্যপি একটা জালার ভিতরে দশ গণ্ডা বাতী জ্বালানা যায়, তাতে কি বেসি আলো প্রকাশ হতে পারে? আর যদি একটী লালঠনে দুটী পাঁচটী বাতী জ্বালা হয় তাতে বেসি আলো হয়ে থাকে কি না? সেইরূপ হাতী প্রভৃতি অন্য জীব সকলের মাথার খুলির গঠন প্রণালী ভিন্ন রূপ হইতে পারে, সেই জন্য তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতি মানুষের মতন প্রকাশ হইতে পারে না। আরও মস্তিষ্কতে একরূপ গাঁট গাঁট গঠন আছে, যে মানুষের সেরূপ গাঁটগুলা গঠন বেসি, সে মানুষ বেসি বুদ্ধিমান; বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ তাহার প্রমাণ করেছেন। অন্য জীবের তাহা খুব কম।

দ। হাতী প্রভৃতির মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, মানুষের মতন পাতলা পাতলা হাড়ে আচ্ছাদিত হইয়া তাদেরও মাথার ঘী সুরক্ষিত হইতেছে, এবং মস্তিষ্কের উপাদান একই বিধ পদার্থে নির্ম্মিত দেখিতে পাইবে; যদ্যপি তেড়া বাঁকা মাথার খুলির গঠন প্রণালী জন্য, তাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি প্রভৃতির অভাব আছে বিবেচনা কর, তাহাও ভুল; তাহলে অনেক সুসভ্য মানুষের মাথা বানরের মতন তেড়া বাঁকা, তারা কেমন করে ডাক্তারী পাস্ করে,—বি এ, এম্, এ, পাস করে? তাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির কার্য্য—জ্ঞানের কার্য্য বেসি পরিমাণে প্রকাশ পায় কেমন করে?

মা। তোমাকে কে বলেছে ঐ সকল জন্তুর বুদ্ধি জ্ঞান নাই?

দ। যে সকল বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মস্তিষ্ককেই জ্ঞান, বুদ্ধি প্রবৃত্তির মুল উপাদান বলেছেন, সেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাই প্রমান করেছেন যে, মানুষ ভিন্ন ইতর জন্তুদিগের জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নাই; তখন যদ্যপি জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি মস্তিষ্কের গুণ, অথবা

শক্তি বিশেষ হইত, তাহা হইলে ঐরূপ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সকল জীবেরই জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, বুদ্ধি একই প্রকার না থাকিবার কারণ কি?

মা। ইতর জন্তুদিগের জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি একেবারে নাই নাকি?

দ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তো অনেকেই এক বাক্যে এইরূপ প্রমাণ করেছেন। ইতর জন্তুদের জ্ঞান না থাকাতেই তাদের আত্মা নাই প্রমাণ হয়েছে। যদ্যপি আত্মা, মস্তিষ্কের গুণ হইত, তাহলে সকল ইতর জন্তুর মস্তিষ্কের সঙ্গে জ্ঞান এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি থাকিত। ইহার দ্বারা প্রমাণ হতেছে যে, মানব শরীরই আত্মার আধার,—এবং আত্মা, জ্ঞান পদার্থ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শারীরিক উপাদান সকল জড় পদার্থ।

মা। তা তো বুঝিলাম, তা ইতর জন্তুদের আত্মা, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নাই তাহার প্রমাণ কি?

দ। সে কথা, জন্তু বিষয়ের উল্লেখ যখন করিব, তখন জিজ্ঞাসা করিও। জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, মন, আশা প্রভৃতি আত্মার অঙ্গ সকল মস্তিষ্কের গুণ নহে এবং জড় শক্তি নহে, সে পক্ষে তোমার আর কোন রূপ সংশয় আছে কি? পরমাণু, আর পরমাণুর মধ্যে যে তাড়িত শক্তি, এই দুই পদার্থ কি একই?

মা। একই বলা যায়।

দ। সকল জড় শরীর মধ্যে তাড়িত শক্তি আছে তা জান?

মা। তাও আর জানি না কি? যেমন মেঘেতে তাড়িত শক্তি থাকাতেই পরস্পর মেঘ সংযোগ হয়ে গাঢ় হয়, আবার মেঘ হতে তাড়িত শক্তি পরিচালিত হইয়া অন্য মেঘে বেশির ভাগ চলে গেলে যে মেঘেতে কম তাড়িত শক্তি থাকে, তাহা বৃষ্টি হইয়া পড়ে যায়; সেই রূপ জীব জন্তুর শরীর মধ্যে তাড়িত শক্তি থাকাতেই শরীরের পরমাণু সকল সংযোগ হইয়া একত্রিত থাকিবার একটী প্রধান কারণ, তাহাও জানি।

দ। তবে শুন, এই শরীর হইতে, তাড়িত বাহির করে, অথবা টেনে নিয়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করা যায় তো ?

মা। তা তো যায়ই যায়।

দ। তা হলে, তখন যে শরীর হইতে তাড়িত টানিয়া বাহির করা হয়, তাহার শরীরের তাড়িত শক্তি কম অথবা এককালে নিঃশেষ হয়ে যাইতে পারে কি না ?

মা। তা তো যাইতেই পারে।

দ। তা হলে পরমাণু সমষ্টি হইতে তাড়িত শক্তি ভিন্ন পদার্থ বলা যায় কি না ?

মা। তাতো যায়ই।

দ। এও সেইরূপ জানিবে। যেমন মেঘ হইতে তাড়িত শক্তি ভিন্ন বস্তু, এবং মেঘ রেণু হইতে তাড়িত শক্তি বিযুক্ত হইলে যেমন মেঘের অস্তিত্ব বিলুপ্ত অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া যায় সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে জ্ঞান প্রভৃতি শক্তি, বিযুক্ত হইলে মস্তিষ্ক বিকৃত অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আরও শুন, যেমন বীণা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের তার, ঘাট্ প্রভৃতি বিকৃত হইলে উত্তম বাদক যেমন তাহা বাজাইতে পারে না, যন্ত্র খারাপ হলে, ভাল বাদকের ও হস্তের যন্ত্র যেমন ঘ্যাং ঘোং শব্দ করে এও সেই-রূপ ; যদ্যপি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, জ্ঞান বুদ্ধি স্বত্বেও সেই বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য্যও বিকৃত হইয়া থাকে এবং বিকৃত যন্ত্রকে যেমন ভাল বাদক পরিত্যাগ করেন,—সেইরূপ বিকৃত মস্তিষ্ককে জ্ঞান বুদ্ধি প্রবৃত্তি আদির আধার আত্মাও পরিত্যাগ করে থাকেন।

মা। তা তো এত শত আগে জান্তে পারি নাই ; এখন বেস্ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তবে তিনি আবার কি কাটান্ করেন, তা শুনি।

স। তিনি কি তোমার দোষ কাটানে আচার্য্যি ?

ম। ঠাট্টা না হলে তোমার কি মুখু চট্ পট্ করে ?

স। আমরা সত্যি সত্যি আর ন্যায় শাস্ত্রের টুলো পণ্ডিত নয়? এক কথা সারাখুণ্ডি শুনে শুনে যে অরুচি হয়ে যায়?

দ। ঠাট্টা কি তোমার আঁবের আচার, না কম্‌লা নেবু, তাই মুখ বদলে নিচ্ছ?

স। তুমি যে গুড়ে মোতা খাওয়াচ্ছ, তাতে আর মনের মুখ না বদ্‌লে বাঁচি কৈ?

আত্মার অমরত্ব প্রকরণ।

মা। আচ্ছা, দয়া! আত্মা যে অমর, তার প্রমাণ কি?

দ। আচ্ছা বল দেখি, আমাদের শরীরে যত বস্তু আছে, অথবা পঞ্চভূতই বল, সে সকলের একটিও কি ধ্বংস হতে পারে।

মা। তা কেন হবে? পাঁচে পাঁচ মিশিয়ে যাবে, অথবা বিলাতি মতে আমাদের শরীরের উপাদানে যত প্রকার ভূত আছে তা সমুদায়ই অন্য সকল ভূতে মিশ্যে যাবে, তা থেকে আবার অন্য নানা শরীর প্রস্তুত হবে, নানা শস্য নানা উদ্‌ভিদ প্রস্তুত হবে এ নিয়ম তো দেখা যায়, এবং তাই শুন্‌ হয়।

দ। যখন আমাদের এই সামান্য জড়শরীরে একটী পদার্থেরও ধ্বংস হতে পারে না, তখন আমাদের আত্মার এত বড় একটা প্রধান সৃষ্টি, তার ধ্বংস হবে তার প্রমাণ কি? জ্ঞানের কি কখন ধ্বংস আছে?

মা। ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

দ। এখানে একটী বিলাতি পণ্ডিতের মত বলি শুন;—আমাদের আত্মা মরে যাবে কিম্বা ধ্বংস হয়ে যাবে, এমন ভাব কখন তোমার কিম্বা কোন মানুষের মনে হয় কি?

মা। তাতো কখনই হয় না। পরকালেও থাক্‌বে এটী তো বেস্ বিশ্বাস হয়।

দ। পাপ করিলে ভয় হয় কেন? পুণ্য কর্ম্ম করিলে আহ্লাদ হয় কেন? মানুষের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব আছে বলেই মনুষ্যের স্বাভাবিক পাপের প্রতি ভয় হয়, এবং সৎকার্য্যের প্রতি অনুরাগ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে ধ্বংশ হইবার হইলে পাপেতে ভয়ের কারণ কি? দুষ্কর্ম্ম করিয়া এই পৃথিবীতে যখন সুখী হইতে পারি, যদি আত্মার এইখানে সব্ ফুরাইয়া যাইবার হইত, তখন ভয়ের বিষয় কি ছিল? ভয় হইবার কারণ কিছুই থাকিত না।

মা। তা তো ঠিকই কথা।

দ। মানুষের জ্ঞানের চরম সীমা, আশার চরম সীমা, ধর্ম্মের চরম সীমা, স্বভাবের চরম সীমা, এজগতে হতে পারে কি?

মা। তার নাম কেন কর? এক ক্রান্তিও পূর্ণ হয় কি না, সন্দেহস্থল।

দ। আত্মা সকল কি উপায়ে উন্নত হইবে সেই জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে, কিন্তু কোন কালে পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না; কখনই চরম সীমাতে উপস্থিত হইতে পারে না, ইহাদ্বারাও প্রমাণ হয় আত্মার উন্নতি আছে এবং আত্মা অমর।

মা। তাও ঠিক কথা।

দ। ঈশ্বরের সকল গুণপনা মানবাত্মাতে প্রকাশ দেখা যায় ন্যায়পরতা, উদারতা, উত্তমতা, মাহাত্ম্য, জ্ঞান এই সকল গুণ মানবাত্মাকে দিয়া স্বজন্ করেছেন, তখন জড়জগৎ থাক্‌বে, আর আত্মার ধ্বংস হবে, ঈশ্বরের প্রধান কৌশল প্রধান নৈপুণ্য বিলোপ হবে, এটী কখন সম্ভব হতে পারে কি?

মা। তা ঐসকল অনুমান ভিন্ন তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়?

দ। তোমার কাছে যমের বাড়ী থেকে ফিরে এসে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবে কে? না হয় একবার দেখে এসগে?

মা। ইতর জন্তুদিগের বুদ্ধি কিম্বা জাতীয় অবস্থার এমন সময় উপ-

স্থিত হয়, যে একই প্রকার অবস্থা থাকে ; দশ বার বর্ষ পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে ; কিন্তু মানবাত্মার সেরূপ অবস্থা নহে, তাহাদের ক্রমশঃই উন্নতির ইচ্ছাই বাড়্‌তে থাকে, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আত্মার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে ; যদ্যপি আত্মার উন্নতির আশা শেষ হইত, কিম্বা সমাজবদ্ধ হইত তাহা হইলে এই জগতেই আত্মার ধ্বংস স্বীকার করা যাইত, কিন্তু তা যখন নাই, তখন আত্মা যে ধ্বংস হয় না, তাহার এইটী বিশেষ প্রমাণস্থল।

মা। তা তো ঠিক কথা। তবে আত্মার উন্নতি কেমন করে হয়, আর উন্নতিরই বা প্রয়োজন কি ?

দ। পিতা মাতা সন্তানকে পাঠশালা হইতে স্কুলে এবং স্কুল হইতে কলেজে, কলেজ হইতে বড় বড় কায কর্ম্মে উন্নতি করায়ে থাকেন, কেন ? সেইরূপ বিশ্বমাতা, বিশ্বপিতা, সন্তান কন্যাগণকে পৃথিবী হইতে উন্নত করাইয়া ক্রমশঃই বেসি উন্নতির অবস্থাতে পাঠান। আত্মার সৃষ্টি, বা উন্নতির প্রয়োজন কি, তা স্রষ্টাই জানেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত বিষয়। ক্রমোন্নতি, জগতের নিয়মই ?

স্বাধীনতা প্রকরণ।

মা। আচ্ছা, দয়া ! "স্বাধীনতা," মানুষের কি ? যদ্যপি এমন বলি, যে মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করে থাকেন, তাহলে স্বাধীনতা কোথায় থাকে ? মানুষ যখন মন্দ প্রবৃত্তিতে ঝোঁকেন, তখন সহস্র চেষ্টা করেও আপনাকে ভাল পথে বাগ্‌য়ে আনিতে পারেন না ; তখন আর মানুষের আত্মার স্বাধীনতা কোথায় ?

দ। তুমি যখন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পড়েছ, তখন আর তোমাকে মানুষের যত প্রকার প্রবৃত্তি আছে, তা আর বুঝায়ে দিতে হবে না। আচ্ছা বল দেখি, বাল্যকালে যে সব ছেলে

দুরন্ত হয়, স্বার্থপরতার অন্ধহয়ে থাকে, পরের দ্রব্য দেখ্‌লেই আপনি নিতে ইচ্ছা করে, বড়হলে তাদের সেরূপ প্রবৃত্তি নিস্তেজ কেন হয়ে যায়?

মা। তখন জ্ঞান বাড়ে, তার সঙ্গে ন্যায়পরতা বাড়ে, তারই জন্য, তখন স্বার্থপরতা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, ন্যায়পরতা বৃত্তি স্বার্থপরতাকে আঘাত্‌ করে, তাতেই স্বার্থপরতা খাটো হয়ে পড়ে।

দ। যখন মানুষের জন্ম হয়, তখন কি একটী খাট একটী বড় প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মে? তাহলে বাল্যকালে ন্যায়পরতাটী না বেড়ে স্বার্থপরতাটী বাড়ে, তারপরে কি ফাঁকা থেকে, অথবা অন্য কোন লুকনা স্থান থেকে ন্যায়পরতা উপস্থিত হয়?

মা। তা কেন হবে? জন্মাবার সময়ে, সব প্রবৃত্তিই এক সঙ্গে মনরূপ-ভাঁড়ারে থাকে, তবে কি না পিতা মাতার যে প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, সন্তান কন্যাদের সেই প্রবৃত্তি প্রবল হয়।

দ। পিতা মাতা যখন মানুষ তখন তাঁদের সকল প্রবৃত্তিই ছিল, এবং তাঁদের ছিল বলেই মানুষে তাহাই পায়; তা বল্‌তে পার পিতারও যে প্রবৃত্তি প্রবল মাতারও সেই প্রবৃত্তি সকল একই রূপ প্রবল? তার প্রমাণই বা কি? তাহলে রাগীর ছেলে শান্ত, খুনের ছেলে ধার্ম্মিক, ডাকাতের ছেলে মেয়ে সাধু হয়ে কেমন করে?

মা। তা তুমিই বল না।

দ। ভাল, তুমি এই যে বলিলে, জ্ঞানের উদয় হলেই ন্যায়পরতা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্যই স্বার্থপরতা নিস্তেজ হয়ে পড়ে; তা হলে আর স্বাধীনতা কাহাকে বলে? জ্ঞানইতো আত্মার বল বিক্রম? সেই জ্ঞান যখন দেখে, স্বার্থপরতা অন্যায় পথে টান্‌ছে; তখনই ন্যায়পরতাকে পাঠাইয়া স্বার্থপরতা খর্ব্ব করে, তা হলে স্বার্থপরতা এবং ন্যায়-পরতা প্রবৃত্তির উপরে জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব কি হইল না? অগ্রে জ্ঞান জানিল, জানিবা মাত্রই জ্ঞান, প্রতিবিধিৎসা, ন্যায়পরতাকে কর্ত্তৃত্বভাবে স্বার্থ-

পরক্তার স্রোতের সম্মুখে উপস্থিত করায়, তাই পাকে স্বার্থপরতা নিস্তেজ হয়? আরও তুমি দেখ, এক জন বাল্যকালে বড় অসচ্চরিত্রতা দোষে লিপ্ত ছিল। সে ব্যক্তির ধর্ম্ম জ্ঞান অথবা কর্ত্তব্য বুদ্ধি হলেই সে ব্যক্তি সেই সব প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতের সম্মুখে ধর্ম্মের বাঁধ দিয়া চরিত্রকে সংশোধন করিয়া লইল; এক সময়ে যে ব্যক্তি কুচরিত্র থাকে, অন্য সময়ে জ্ঞানের স্বাধীনতাতে, সেই দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির স্রোত হইতে আপনাকে ভাল পথে টেনে তুলিতেছে; তখন আর আত্মার স্বাধীনতাতে অবিশ্বাসের যো কোথায়? এক সময়ে তুমিই খুব রাগী ছিলে, অভিমানিনী ছিলে, এখন তোমার এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন হল কেমন করে? যদ্যপি পিতা মাতার মধ্য হইতে জিঘাংসা প্রভৃতি প্রবলা প্রবৃত্তি পাইয়া থাক, তাহলে, আবার সেই প্রবৃত্তিকে জ্ঞানের কর্ত্তৃত্বে ফিরয়ে এনে যখন এমন শান্ত প্রকৃতি হইতে পারিয়াছ, তখন আত্মার স্বাধীনতার প্রমাণের উদাহরণ তোমাতেই তো রহিয়াছে, আর অন্য স্থানে অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি আছে?

মা। কোন কোন মতে এরূপ বলে, যে যেমন প্রবৃত্তির উত্তেজনা শক্তি নিয়ে মানুষ জন্মে, তাঁকে সেই প্রকৃতির লোক হয়ে থাকৃতে হয়; বাল্যকাল থেকেই তাঁর সেই প্রবৃত্তি বেসি উত্তেজিতা হয়ে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত থাকে।

দ। তা হলে বাল্যকালে যে সব ছেলে মেয়ে রাগী, স্বার্থপর, এবং পাখী ফড়িং হত্যা কর্‌তে বড়ই মজবুদ্, তাঁরাই আবার ন্যায়বান, দয়াবান্, শান্ত স্বভাব হল কেমন করে? এতেই প্রবৃত্তির উপরে জ্ঞানের অথবা আত্মার স্বাধীনতা, কিম্বা কতৃত্ব তাহা স্পষ্টই দেখা যায়।

মা। আচ্ছা, তবে আত্মাতে কি মন্দভাব নাই?

দ। মানুষের আত্মা, খাঁটি পাকা সোণা,—নির্জ্জলা দুধ, শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্র,—শত দল পদ্ম অপেক্ষাও নিষ্কলঙ্ক; প্রাতঃকালের তপ্ত কাঞ্চন তুল্য—সোণার থাল তুল্য সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল।

মা। তবে, তাতে দাগ ধরে কেন?

দ। মানুষ স্বাধীনতা অপব্যয় করেন,—প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসান্ দেন, বলেই কলঙ্ক ধরে।

মা। তা হলে বাল্যকালেই মন্দ ছেলে দেখা যায় কেন?

দ। পিতা, মাতা, এবং প্রতিবাসীদের চরিত্র দেখে, আপনার মধ্যেতেও সেই সব অস্তস্ফুটিত প্রবৃত্তি গুলিকে সেই পথেই ছেড়ে দেয়; বয়স্কদিগকে স্বাধীনতা অপব্যয় কর্‌তে দেখে, বালকেরাও অনুচিকির্ষা বৃত্তিকে অবলম্বন করে থাকে; কিন্তু আবার যখন তাদেরই জ্ঞান, অথবা আত্মা উন্নত হয়ে উঠে; তখন তাঁরাই আবার স্বাধীনতা প্রভাবে প্রবৃত্তি স্রোত হইতে আপনাকে আপনিই উঠাইয়া আনেন।

স। ও মায়া! যে তুমি ঠ্যাকারে, গেদারে মট্ মট্ কর্‌তে, আজ্ সেই তুমি, সোণার মায়া হয়েছে, সেটী কেমন করে হলে, তাই কেন ভেবে দেখ না?

দ। উটি ভারি ভুল মত। আচ্ছা, তুমি বল দেখি, জলের প্রকৃতি ও দেখ্‌ছ, আর মাটির প্রকৃতিও দেখ্‌ছ, এবং বাতাসের প্রকৃতিও দেখ্‌ছ; ঐ কটী পদার্থের মধ্যে কোন রূপ অপবিত্র ভাব আছে কি? যখন ঐ মাটিতে আর জল এবং বাতাস পরস্পরে স্থিরভাবে কার্য্য করে ততক্ষণ মাটি, জল, বাতাস পরস্পরের বিশুদ্ধ ভাবে পরিষ্কার ভাবে কেমন থাকে? আবার যখন ঐ স্থলে ঝাঁপাই ঝোড়া হয়, জলে পড়ে লাপা লাপি করা হয়, তখন ঐ জল ঘোলা হয়ে, ঐ জল কেমন বিকৃত ভাব ধারণ করে থাকে? আর স্থির জলাশয় হইতে স্থির ভাবে ঐ জল যখন কলসী করে তোলা হয়, তখন জলের কেমন নির্ম্মল ভাব থাকে? সেই রূপ মানুষের মনের প্রবৃত্তি সকলেরই নিষ্পাপ এবং নির্ম্মল প্রকৃতি; কিন্তু যখন ঐ সকল প্রবৃত্তিকে অপব্যয় করা হয়, তখনই প্রবৃত্তি সকল বিকৃত ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যেমন মেঘের পর-

অণু সকলকে এক যোগে স্থির রাখিবার জন্যই দয়াময় মেঘের পরমাণুর মধ্যে তাড়িত শক্তি প্রদান করেছেন, তাড়িত শক্তিই যেমন মেঘের পরমাণু বর্দ্ধনি রক্ষার একটী মাত্র প্রধান, উপাদান, সেইরূপ মানব প্রবৃত্তি সকলকে সমান ভাবে রাখিবার প্রধান উপাদানই মানুষের স্বাধীনতা। যখন প্রবৃত্তি গণের মুখের লাগাম ছাড়িয়া অথবা লোলকাছি প্রদান করে, তখনই মানুষের প্রবৃত্তি সকল বিপরীত পক্ষে অন্যায়পথে যাইতে থাকে, এবং সেইজন্যই মানুষ যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম করে ফেলেন। তুমি ফুলের কেমন পবিত্র প্রকৃতি তা দেখেছতো? যখন ঐ ফুলের গায় কাদা প্রভৃতির ছিটে লাগে, কিম্বা ফুলের গায়ে পোকা ধরে তখন তুমি কি মনে কর যে ফুলের প্রকৃতিই ঐ রূপ? যখন মেঘলা করে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিকে ম্যাড় মেড়ে করে ফেলে তখন তুমি চন্দ্র সূর্য্যের "আকৃতিকে কিম্বা চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিকে মেঁড় মেড়ে মনে কর কি? মানুষের শরীরে কাদা ধুলা লাগিলে, কিম্বা ফোড়া ঘা হইলে মানুষের শরীরের প্রকৃতিই ঐ রূপই, এ প্রকার কি কখন মনে কর? সেই রূপ মানব প্রকৃতি অথবা মানুষের প্রবৃত্তি একটীও মন্দ নহে, একটীও অপবিত্র নহে; তবে স্বাধীনতা চক্ষু বুজে থাক্‌লেই, স্বাধীনতা অপর পথে ঝোঁক দিলেই প্রবৃত্তি অন্যায় পথে গিয়া নানা পাপ অর্থাৎ অন্যায় কার্য্য করিয়া আত্মাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

মা। তা তো এখন বুঝ্‌তে পারলুম।

দ। আরও শুন; একজন মানুষের শরীর হইতে তাড়িত শক্তি বাহির করে অপর একজন মানুষের গায়ে প্রবেশ করাইতে যখন মানুষে পারিতেছে তখন মানুষের স্বাধীনতা থাকা, এই খানেও চূড়ান্ত প্রমাণ, তা ঐটী বড় কটর মটর হবে বলেই সংক্ষেপে বল্‌লুম।

মা। তা, ওকথার মানে কি?

দ। এর মানে এই;—মানুষ, প্রবৃত্তির অধীন হলে, মানুষের

শারীরিক ব্যাপার সকলই জড় জগতের অথবা জড় শরীরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলিতে হয়; তা হলে মানুষ যা ভাল মন্দ করেন, সে সব মানুষকে জড় জগতের অথবা জড়শরীরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মতন করিতেই হইবে; কিন্তু এটী ভারি ভূল কথা বলে অনুভব হয়; যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এক জন ডাক্তার অপর একজন মানুষের শরীর হইতে তাড়িত শক্তি বার করে, অপর একজন মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া, তাঁহার শরীরের তাড়িতের অভাব পূরণ করাইতেছেন, তখন মানুষ যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অধিকারী, তাহা উহাদ্বারাও প্রমাণ হয়; তা না হলে একস্থানের নিয়ম অন্যস্থানে পরিবর্ত্তন করাইতে মানুষের সাধ্য থাকিত না।

স। বলি তুমি কি একটীও হারিবে না?, তুমি না হারিলে আর যে আমাদের মান থাকে না?

মা। তোমার মানের গোড়ায় ছাই পড়ুক।

স। তা বেসই তো, তাহলে আমার শাঁপে বর হইবে, তাহলে আরও আমার মানের গোড়া ফেঁপে উঠ্‌বে।

মা। আরও কাঁপ্‌লে শোত্‌ হবে যে? এই তো তোমারই মানের দায়ে শিব বাবুর গলায় কেঁচে মানের জ্বর উঠ্‌ল; তিনি তোমারই মানের দায়ে পড়ে সত্যের অপমান করতেও কুণ্ঠিত হলেন না, আরও মান চাও কি? মান্‌ মান্‌ করেই পৃথিবী মর্‌তে বসেছে।

শরীরাদি যন্ত্র প্রকরণ।

মা। আচ্ছা দয়া! তুমি বল দেখি, আমি যদ্যপি বলি, এই শরীরটী কেবল মাত্র ঘড়ির কলের মতন, পারেনো অথবা হারমোনিয়ম বাজনার মতন, যেমন ঘড়ির কল খারাপ অথবা ঐ বাজনার তার ছিঁড়ে বা মর্চ্চে ধরে কিম্বা অন্য রূপ বেকল হলে, আর তাহা চলে না

বাজেও না, যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়, সেই রূপ শরীরের যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলেই, শরীর নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে ; আর শরীর নড়িতে চড়িতে পারে না। তা এ কথার জবাব কি ?

দ। ও কথার জবাব, আর কতবার দেব ? এইতো সকল বিষয়ই ঐ কথার জবাব হতেছে।

স। "কালাকে বুঝাও যত কাণে নাহি শুনে, ঢেঁকিকে বুঝাও যত, সে নিতাই ধান ভানে !" এতেও বুঝতে পারছ না ? আবার সেই কথা ?

দ। তা, আচ্ছা, শুন ; মরবার সময়ে ঐ শারীরিক যন্ত্রের উপাদান সকল পড়ে থাকে তো ? তখন শরীরের নড়ন চড়ন শক্তি থাকে না কেন ?

মা। তা তো বললুমই, কল খারাপ হয়ে যায়।

দ। আচ্ছা, ঘড়িয় কল কি কখন আপনি চলে ? ঘড়ির কলই এবং স্প্রিং সকলই আছে সত্য ; হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রেও নানারূপ তার এবং কল আছে সত্য, কিন্তু ঐ সব কলের জিনিষে, বা ঘড়িতে একজন জ্ঞানাপন্ন জীব, যদ্যপি প্রতিদিন চাবি না ঘুরয়ে দেন, তাহলে দুচার দিন ও কি কখন আপনা আপনি ঐ ঘড়ি আপনার ইচ্ছাতে চলতে পারে ? না ঐ বাদ্য যন্ত্রকে এক জন জ্ঞানাপন্ন অথবা চৈতন্য বিশিষ্ট লোকে না বাজালে, না কল নেড়ে দিলে, আপনা আপনি কখন বাজতে পারে ?

মা। তাতো পারেই না।

দ। তা হলে ; শরীর রূপ যন্ত্র চালাইতে সক্ষম এমন জ্ঞান সম্পন্ন পদার্থ শরীরের ভিতর না থাকলে শরীরটী নিয়ম মত চলাবুলা করে কেমন করে ? কার্য্যক্ষম হয় কেমন করে ?

মা। তবে শরীর রূপ যন্ত্র যখন ভাঙ্গা থাকে, তখন কোন অঙ্গ বিকল হলে সেই জ্ঞানাপন্ন পদার্থ তাহা সংগঠন করে নিতে পারে না কেন ?

দ। যেমন বাদ্য যন্ত্রের তার প্রভৃতি জড়ামড়ি হয়ে গেলে, বা অন্য একটা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেলে, ভাল বাজ্‌য়ের হাতে সেই যন্ত্র থাকলেও এবং ঐ বাজ্‌য়ে ভাল করে বাজাতে চেষ্টা সহস্র করলেও যেমন বাজনা ঘেং ঘাং ফ্যাং ফোঁং করে বেসুর বাজিয়া থাকে, সেইরূপ শরীর কলের কোন অংশ বিকৃত হয়ে গেলে, আত্মা, বা প্রাণ মনাদি শরীর মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলেও, শারীরিক কলের যে যে অংশ খারাপ বা বিকৃত হয়ে যায়, তাহার কার্য্যও বিকৃত রূপে প্রকাশিত হয়; যেমন মানুষের মস্তিষ্কের কোন অংশ বিকৃত হলে পাগল হতে হয়, অর্থাৎ সেই স্থানদিয়া ভাল রূপে কার্য্য প্রকাশ হয় না, কর্ণেরা চর্ম্মের ভাবান্তর হলে, কালা হয়,—চক্ষের উপরে ছানি পড়িলে কানা হয়, অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্রের তারে বা ছিদ্রে মলা ধরলে যেমন, ভাল বাদকের হাতে থাকলেও তাহাতে বাজনা বাহির হয় না, সেই রূপ চক্ষের উপরে ছানি পড়িলে, আত্মা মন প্রাণ শরীর মধ্যে থাকলেও শরীর যন্ত্রের কোন অংশ বিকৃত হলে, সেই অংশের ভাল এবং সুচারু কার্য্য হয় না। সুকল যন্ত্র এবং বাদক দুয়ে মিল হলে যেমন বাজনা ভাল প্রকাশ হয়, একটীর অভাবে আর একটী যেমন আবশ্যক মত কার্য্য করিতে পারে না; সেই রূপ শরীর যন্ত্র সম্পূর্ণ অবস্থাতেই আত্মা এবং মন প্রাণ প্রভৃতি কার্য্য ভাল এবং প্রকৃত রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যে অংশটী বিকৃত হয়, সেই অংশটীর কার্য্য ভাল প্রকাশ পায় না। আবার যেমন ভাংগা ঢোল, তার ছেঁড়া সেতার, বা তার ছেঁড়া মরচে ধরা অকর্ম্মণ্য পিয়ানো কিম্বা স্প্রিং ছেঁড়ে কলবিগড়না ঘড়িকে, যেমন মানুষ বা বাদক পরিত্যাগ করে থাকেন, সেই রূপ শারীরিক সকল কল যখন অকর্ম্মণ্য হয়, তখন জীবের শরীর হইতে আত্মা, অথবা মন প্রাণ সকলেই তাহা ত্যাগ করে প্রস্থান করে থাকে। আরও শুন, যেমন ঘড়িটী বা পায়োনা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র এক জন জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন ইচ্ছা বিশিষ্ট জীবে প্রস্তুত না করিলে কখনই প্রস্তুত হতে পারে না, সেইরূপ আত্মা বিশিষ্ট শরীর

রূপ কৌশলপূর্ণ যন্ত্র সকল এক জন জ্ঞানাপন্ন কৌশলময় কর্তৃক প্রস্তুত হওয়া ও স্বীকার না করিয়া থাকিবার যো নাই।

স। আচ্ছা, শরীর মধ্যে যে চৈতন্য রূপ একটী পৃথক পদার্থ আছেন, তাহা প্রমাণের পক্ষে আমাদের ঋষিদের কি রূপ মত বা বল দেখি ?

দ। কপিল নামে সাংখ্য শাস্ত্রের লেখক কি বলেছেন, শুন, -

"ন সাংসিদ্ধিক চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টে"

অর্থ।

"চৈতন্য ভূতের বা ভৌতিক পদার্থের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম নহে"

ভূত মানে জান ? এই পঞ্চ ভৌতিক শরীর এখানে বুঝায়। অথবা এই পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে চৌষট্টি প্রকার ভূত প্রকাশ হয়েছে, ঐ সকল ভূত বা পদার্থ পরীক্ষা করিলে তাহার একটী হইতেও অথবা রসায়ন যোগে সকলকে পরীক্ষা করিলে যখন তাহার কোন অংশ হই তেও চৈতন্য প্রকাশ হয় না, তখন চৈতন্য পদার্থ যে স্বতন্ত্র তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহার বিরুদ্ধে কোন মতই অথবা যুক্তি স্থান পাইতে পারে না।

স। তা বল! মেয়েদের মুখে জেঠামী কথা যেন গালে চড় মার্‌তে আসে! তুমি মাঝে মাঝে এমন কটর মটর কথা বল, সেগুলি যেন ফুলের সাজিতে নুড়ী ছড়ানো হয়ে যায়।

মা। সরস্বতী! তুমি বন বড়ই ঠোঁট কাটা মেয়ে।

স। তা হক্‌কথা বল্‌ব, তাতে যদি রাগ কর তো ঘরের ভাত্ বেসি করে খেও! আমার মনে কোন্ কাপ্ নাই বন!

স্বয়ম্ভূ ও স্বভাব প্রকরণ।

মা। ও বন দয়া! ঐঃ যা! মাতা খেতো আর কি! এক কথা—তাতেই আমাকে হারিয়ে দিতেন, ভাগ্যি মনে পড়্‌লো?

দ। কি বাকি আছে তা বল।

মা। আমি যদি বলি,—এই সংসার সকল আপনা আপনি হয়েছে, তুমি তার কাটান করে দাও দেখি?

দ। তার তো জবাব হয়ে গেছে? ঈশ্বর ভিন্ন আপনা আপনি কোন বস্তুই হতে পারে না।

মা। তবে ঈশ্বর হলেন কোথা থেকে? আমি যদি বলি স্বভাব থেকেই, এই জগৎ সংসার উৎপন্ন হয়েছে; যেমন চুনে হলুদে মিশুলে লাল রং আপনা আপনি হয়ে যায়;—যেমন চেলে আর পচা গুড়ে সিদ্ধ কর্‌লেই মদ তৈয়ার হয়, সেইরূপ নানা জিনিসের যোগে স্বভাব হইতে এই গাছ পালা, মানুষ গোরু জীব জন্তু সংসারের সকল বিষয়, এবং গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পৃথিবী, পাহাড়, পর্ব্বত, সকল জগৎ সংসার প্রস্তুত হয়েছে।

দ। তুমি স্বভাব, কাহাকে বল?

মা। স্বাভাবের আর একটী নাম 'প্রকৃতি,' অথবা যে নিয়ম দ্বারা আপনা আপনি জগৎ সংসার নির্ম্মাণ হয়, এবং নাশ হয়ে থাকে কিম্বা যে মূলশক্তি থেকে জগৎ সংসার উৎপন্ন হয়েছে, সেই শক্তিকেই স্বভাব বলে থাকে।

দ। আচ্ছা, স্বভাব, বা প্রকৃতি অথবা মূলশক্তি যাহাই কেন বল না, তাহা কোথা থেকে হল? স্বভাবের স্রষ্টা কে?

মা। স্বভাবের আবার স্রষ্টা কে? স্বভাব চিরকালই আছে, এবং চির কালই থাকিবে; স্বভাবের আর সৃষ্টি কিষ্টি নাই; সেই স্বভাব অনন্তকাল হইতেই আছে, অনন্ত কালই থাকিবে।

দ। স্বভাবের আকার কিছু আছে কি ?

মা। ভাল পাপ দেখি! তুমি উকীল হতে পার নাই? আমাকে কি তুমি আদালতের সাক্ষী পেলে না কি? এক্ কথা সাত্‌শোবার্ কেন? স্বভাবের কি কখন আকার আছে? সে যে নিরাকার বস্তু; সকল দ্রব্যতেই, সকল স্থানেই, সকল ঘটনাতেই, সকল দেশে, সকল কালে, সকল জগৎ সংসারে, সকল পদার্থে সমভাবে স্বভাব বিদ্যমান থাকে। স্বভাবের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় হয় নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, স্বভাব অনাদি অনন্ত পরিপূর্ণ।

দ। স্বভাবকে "স্বয়ম্ভূ" বলে থাক কি না?

মা। তোমার মাথাবকানা রোগ নাকি? স্বভাব তো স্বয়ম্ভূই।

দ। তবে একটী নিরাকার জন্ম মৃত্যু বিহীন, অক্ষয় অদ্বয় সর্ব্ব-শক্তিমান মূলশক্তি জগৎব্যাপী পরিপূর্ণ অনন্ত "স্বয়ম্ভূ" আছেন, স্বীকার করতো?

মা। কাযে কাযেই স্বীকার করি।

দ। তুমি যেরূপ মূলশক্তিকে "স্বয়ম্ভূ" বলিতেছ,—তুমি যে বিশ্বব্যাপী অক্ষয় অদ্বয় নিরাকার পরিপূর্ণ অনন্তকে, স্বয়ম্ভূকে অথবা স্বভাবকে জগৎস্রষ্টা বলিতেছ, আমিও সেইরূপ নিরাকার বিশ্বব্যাপী অক্ষয় অদ্বয় পরিপূর্ণ অনন্ত শক্তির আধার স্বয়ম্ভূকে "ঈশ্বর" বলিতেছি, এখন ভেবে দেখ দেখি তোমার আর আমার কথায় প্রভেদ কি আছে? কেবল শব্দের বিভিন্নতা বৈ তো আর কিছুই মত ভেদ দেখা যায় না। তুমি বলিতেছ এইরূপ;—"বিদ্যুতেই আলো হয়ে থাকে" আমি বলিতেছি এইরূপ;—"তাড়িত্ হইতেই আলো প্রকাশ হয়" এইমাত্র প্রভেদ। তাড়িৎ শক্তির প্রভাবেই যেমন বিদ্যুত্ অথবা আলোক এবং তাহার প্রকাশ গুণ বা দাহিকতা গুণ ইত্যাদি বলা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের সৃষ্টিকারিণী শক্তিকেই "স্বভাব" অথবা "প্রকৃতি" বলা হয়।

যেমন আগুনের প্রকাশ শক্তি এবং দাহিকতা শক্তি দুই আছে, প্রকাশ শক্তি এবং দাহিকতা শক্তি যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, আগুনের সহিত আলোক, কিম্বা দাহিকতা শক্তির যেমন প্রভেদ নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত মূল প্রকৃতি অথবা মূল স্বভাবের প্রভেদও নাই। যেমন কেবল মাত্র অগ্নির দাহিকতা শক্তিকে "আগুন" বলা যায় না, সেই-রূপ ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তিকে অর্থাৎ প্রকৃতি অথবা স্বভাবকে 'ঈশ্বর' ও বলা যায় না। স্বভাব বা প্রকৃতিকে ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি বিশেষই বলা যায়।

মা। তবে সেকালের দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ প্রকৃতি পুরুষ দুই থেকে যোগে সংসার সৃষ্টি হয়েছে শাস্ত্রে কেন বলে গেছেন?

দ। তাঁরা ঈশ্বরকে "পুরুষ" এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকারিণী শক্তিকে "প্রকৃতি" বলে স্ত্রী পুরুষ সাজ্যে কল্পনা করে ঐরূপ লিখেগেছেন। যদি কেহ তোমাকে আর তোমার শক্তিকে স্ত্রী পুরুষ কল্পনা করে তোমার কায কর্ম্মের বর্ণনা করেন, তা যেমন সত্য নহে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন নহে, সেই একই ঈশ্বর।

মা। মতভেদ এখনও আছে; আমি যদি বলি,—"প্রকৃতি" কোন একটী মূল নিয়ম মাত্র। তা হলে মতভেদ হচ্চে না?

দ। "নিয়ম" কথাটী মুখে আন্‌লেই সেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তা, অর্থাৎ নিয়ম কর্ত্তা একজন যে উপস্থিত হয়ে পড়েন, তার কি বল দেখি? যেমন "আইন" বলিলেই সেই সঙ্গে আইন স্রষ্টা রাজা উপ-স্থিত হইয়া পড়েন, সেইরূপ "নিয়ম" বলিবা মাত্রই নিয়ম কর্ত্তা উপ-স্থিত হয়েন; সেইরূপ "শক্তি" বলিলেও শক্তিমান্, শক্তির আধার উপস্থিত হয়ে পড়েন, তার কি বল দেখি?

মা। বেস্‌তো পড়্‌বে কেন?

দ। আইন সকল কার? একথার জবাবে লোকে কি বলে? "আইন রাজার" সেইরূপ নিয়ম বা শক্তি বলিলে "নিয়ম বা শক্তি

কাহার” এইটী তখনই মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন লোকের হৃদয়কে উচ্চৈস্বরে বলিতে হয় “নিয়ন্তারই নিয়ম, শক্তিমানেরই শক্তি।” চূণে হলুদে মিশুলে রাংয়া রং হয়, এইটীই নিয়ম বা স্বভাব; হলুদে চূণে মিশ্রিত বস্তু টুকু দেখ্‌লেই মনে মনে প্রশ্ন হয় “এই জিনিষ টুকু কি? এই স্বভাব বা প্রকৃতি টুকু কোন্ পদার্থের? তখনই মনে মীমাংসা আসিয়া বলে দেয়, এই প্রকৃতি বা স্বভাবটী চূণে হলুদের।” এইরূপ গাছের কোচি পাতা, কুঁড়ী, ফুল, ফল হওয়া পর্য্যন্ত আর ফল ডাঁশানা, পাকা হওয়া, এবং পাক্‌লেই পড়ে যাওয়া বৃক্ষের অঙ্কুর থেকে আর শেষ পর্য্যন্ত যত ঘটনা বৃক্ষের হয়ে থাকে, সেই সকল নিয়ম, বা প্রকৃতি অথবা স্বভাব কার? এইরূপ জিজ্ঞাসা কর্‌লে তার জবাব দিবে কি?

মা। কেন সবই গাছের প্রকৃতি বা স্বভাব বলা যাবে।

দ। যেমন ঐ সকল প্রকৃতি অথবা স্বভাবের আধার গাছ, অথবা ঐ সকল নিয়ম, প্রকৃতি, স্বভাব যাই কেন বলনা, ঐ সকল যেমন গাছের প্রকৃতি বা স্বভাব, বা নিয়ম, সেইরূপ সমস্ত জগতের এক মাত্র মঙ্গল প্রকৃতি বা মঙ্গলময় স্বভাব অথবা মঙ্গলময় নিয়ম কাহার? সেই নিরাকার মূলশক্তি অনন্তজ্ঞান ঈশ্বরেরই। তাঁরই মঙ্গলময় অচিন্ত্য অসীম, অনন্ত জগৎ ব্যাপী নিয়মকেই স্বভাব অথবা প্রকৃতি বলা যায়। অথবা ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির শক্তিকেই স্বভাব অথবা প্রকৃতি বলা যায়। যেমন কর্ত্তা না থাক্‌লে কার্য্য হতে পারে না, তেম্‌নি স্বভাব বা প্রকৃতির আধার না থাক্‌লে, নিয়মের কর্ত্তা নিয়ন্তা না থাক্‌লে, নিয়ম স্বভাব, অথবা প্রকৃতি যা নাম কেন দাওনা ইহার একটী থাক্‌তে পারে না। যেমন রাজা ভিন্ন আইন অর্থাৎ রাজ নিয়ম, হয়না, হতে পারেও না; আইনের নাম শুনিবা মাত্র যেমন “রাজার আইন” বলে এইটী মনে পড়ে যায়, কোন তর্ক বিতর্ক ভাবনা চিন্তা না করেও যেমন আইনের নাম

শুনিলেই " রাজার আইন " মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধারণ প্রকৃতি সাধারণ নিয়ম সাধারণ স্বভাব স্মরণ হইবা মাত্রই, নিয়ন্তা, স্বভাবী, প্রকৃতির মূলাধার সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরই আসিয়া লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে পড়েন ; এখন এর জবাব কি বল দেখি ? আর প্রকৃতি অথবা স্বভাব অথবা নিয়ম, বলিলেও ঐ সকলের মূল যে " স্বয়ম্ভূ " তাও স্বীকার করতে হয়, তবে " স্বয়ম্ভূ " না মেনে থাকবার যো কি ?

মা। না হয় এটাও হারলুম ; আরও আমার আছে।

সরস্বতী। দয়া ! ইচ্ছা করে তোমাকে আমার আঁচলটা চিরে ইলেন্স দিই। তোমার ওটাতো পেট্ নয়, উটা পচা পান্তার হাঁড়ী দেখি যে !

দ। তা বন আজ্ কিছু খাবে এসো, কেবল সুদু কথাতে কি হবে ? চল যাই।

স। তুমি যে হারাচ্ছ ; তুমি না খাবার দে, বরং একবার হেরে যাও।

মা। না হয় কেঁদে জিতে যাওনা কেন ?

স। ওরূপ কেঁদে জেতা তো আমাদের জেতের রীতি পড়েই আছে ?

স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির স্থায়ী সম্বন্ধ প্রকরণ।

মায়া। আচ্ছা দয়া ! কেহ কেহ এরূপ বলেন যে ঈশ্বর অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাতা কেবল মাত্র জগৎ সংসার নির্ম্মাণের কৌশল সংস্থাং

পন করিয়া দিয়াছেন ; সেই নিয়মানুসারেই জগৎ সংসারে জীব জন্তু গাছ পালা, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, সকল উৎপত্তি বিনাশ হইয়া থাকে ; স্রষ্টা অথবা নির্ম্মাতার সহিত এখন আর জগতের কোন সম্পর্ক নাই। যেমন এক জন ছুতার এক যোড়া কপাট প্রস্তুত করে দিয়ে, সেই কপাটকে গৃহস্থের দ্বারে লট্‌কাইয়া দিলে, আর যেমন ছুতারের সহিত কপাটের কোন সম্পর্কই থাকে না, অথবা এক জন রাজমিস্ত্রী একটী বাটী প্রস্তুত করিয়া দিলে, বাটী প্রস্তুতের পরে রাজমিস্ত্রীর সহিত বাটীর কোন সম্পর্কই থাকে না, বাটী ব্যবহার জন্য যেমন সেই রাজমিস্ত্রীর আর কোন সাহায্যই প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ জগৎ নির্ম্মাণের পরে জগতের সহিত জগৎ নির্ম্মাতার (ঈশ্বরের) কোন রূপ সম্পর্ক ও নাই এবং সংসার তাঁহার সাহার্য্য প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়া ও আবশ্যক করে না।

দ। আচ্ছা, বল দেখি, আমাদের শরীর অথবা জীব শরীর মধ্যে জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ইচ্ছার, সত্তা কিম্বা অস্তিত্ব যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই শরীরের কার্য্য চলে থাকে ; যখন জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ইচ্ছা প্রভৃতির সত্তা এবং অস্তিত্ব জীব শরীর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে তখন কি আর শরীরের কার্য্য চলিতে পারে ?

মা। তা কেনই বা পারিবে ?

দ। সেই রূপ ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান শক্তি এবং অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছা যতক্ষণ এই অনন্ত আকাশের সহিত সমস্ত জগতের মধ্যে অনুক্ষণ বর্ত্তমান আছে বলেই জগতের কার্য্য চলিতেছে। জ্ঞানাপন্ন জীবের ইচ্ছার অস্তিত্ব নাই অথচ অন্ধভাবে মঙ্গল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে ইহা প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞানীর ইচ্ছা নাই অথচ কার্য্য আছে এটী কে প্রমাণ করিতে সক্ষম ? তাঁহা "স্বভাব এবং অস্তিত্ব" প্রকরণে মীমাংসিত হইতেছে।

মূল কারণ প্রকরণ।

মা। আচ্ছা দয়া! তিনি আমাকে এই কথা বলেন;—যখন ঈশ্বরকে আমরা বুঝতেই পারি না, ঈশ্বর যখন অচিন্ত্য, মানব-জ্ঞানের অতীত, তখন তাঁর বিষয় নিয়ে মিছি মিছি ভেঁতে ঘোঁট করবার দরকার কি? তা বল! ও মতটী কি?

দ। সে কথাতো আর হরি বাবুর নয়,—একজন ফরাসি দেশের বড় জ্ঞানী পণ্ডিত (অগস্ত কোমত নামক) তাঁরই ঐরূপ মত; আর প্রায় আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইবে, আমাদের হিন্দুস্থানে শাক্যসিংহ, যাঁকে লোকে বুদ্ধদেব, অথবা "বৌদ্ধ অবতার" বলে থাকেন, তিনি জীবনে ঐরূপ মত চালিয়ে কত দেশ দেশান্তরের লোককে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নামগন্ধও করেন নাই, কেবল ধার্ম্মিক হইবার জন্য লোককে উপদেশ দিতেন, তিনি কত শত কোটি মানুষকে ঐরূপ মতে শিষ্য করেছিলেন, তাঁহার জীবন, এবং মত একই প্রকার কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল; কিন্তু কোমত সাহেবের ঐ মত এবং তাঁর জীবনের কার্য্য বিভিন্ন রূপ হইয়া পড়ে, তা পরে বলব। ঐ কোমত সাহেব বলেন—"মূলজ্ঞান বা মূলশক্তি অথবা মূলতত্ত্ব যখন আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না, তখন তাঁর কথা নিয়ে আন্দোলন করা আমাদের দরকার নাই; তাঁর কথা নিয়ে বৃথা গোলমাল করায় কোন ফল নাই; তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আন্দোলন করা মানুষের অধিকার নাই।"

মা। ও আবার কিরূপ কথা?

দ। বুঝতে পারলে না? "মূলজ্ঞান, মূলশক্তি, মূল তত্ত্ব, মূল কারণ" এইগুলি সকল ঈশ্বরকেই বলা যায়।

মা। ও মা! তাঁকে নিয়েই যত টানাটানি? তার পরে বল।

দ। তাঁরা বলেন—কোন মূলতত্ত্ব, কি মূলজ্ঞান বা মূলশক্তির বিষয় মানুষে কখন বুঝ্‌তে পারেও নাই, পারিবেও না, এবং কোন কালে বুঝ্‌তে পারিবার সম্ভাবনাও নাই; কেবল গুড়ে চেলে বক-যন্ত্রে ফুটাইলে মদ প্রস্তুত হয়; এইরূপ নিয়ম সকলই আমাদের জানা আবশ্যক; তার ভিতরে যে কি শক্তি আছে, সে শক্তি কেমন, সে শক্তি কেমন করে উৎপন্ন হ'ল, সে সকল জানিবার জন্য চেষ্টা করাও আমাদেব দরকাব নাই। মেঘ হলেই জল হয়, এইরূপ নিয়ম আছে; সে নিয়ম কে করেছেন তা আমাদের জানিবার দরকার নাই। পড়ে শুনে জ্ঞান বৃদ্ধি হলে, গাছপালা থেকে ঔষধ বার কর্‌তে পারা যায়,—সকল জীবজন্তুব শরীর কেটে ছিঁড়ে নাড়ীনক্ষত্র কোথায় কি বস্তু আছে, কোন্ ঘটনাতে কোন্ রোগ উৎপন্ন হযে থাকে, তার অনেকটা জানা যায়;—জড় জগতের আলোচনা করে কোন্ ঘটনাতে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় হয়ে থাকে, কোন্ নিয়মে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, কোন্ নিয়মে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তার খানিকটা জানা যাইতে পারে, ঐ সকল নিয়ম দেখে চুপচাপ মেরে কাজকর্ম্ম করাই উচিত; তার পরে মানুষের জ্ঞান কোথা থেকে হল, কোন্ মূল কারণ থেকে ঐ সকল নিয়ম হয়ে থাকে, কে ঐ সকল গাছপালার সৃষ্টি কর্‌লে, কেই বা বিশ্বসংসার রচনা কর্‌লে, সে সকল দুরবগাহ ব্যাপার অনু-সন্ধান করবার প্রয়োজন নাই।

মা। এই তো আমিও শুনেছি।—

দ। এ কথার মধ্যে একটী ভারি ভুলকথা আছে; আচ্ছা তুমি জানতো সমুদ্রে অথবা অপর জলেতে অতি ক্ষুদে ক্ষুদে সব কীটাণু আছে। এমন কি, সেই সব কীটাণুর আকৃতি মানুষে খালি চক্ষে দেখিতেও পায় না, সেই সকল কীটাণুর কস্মিনকালেও সমুদ্রের আয়তন কত বড় ব্যাপার তাহা অনুভবের শক্তি নাই; এবং সমুদ্রে,

কত রত্ন কত রূপ জীব আছে,—সমুদ্রের কত দূর ক্ষমতা আছে, তাহার সীমা করা তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্য নাই; এমন কি, সমুদ্রের একটী একটী অতি সামান্য তরঙ্গও ঐ সকল কীটাণুর নিকটে একটী একটী প্রকাণ্ড জগৎ বলে অনুভব হইবার বিচিত্রতা নাই: সমুদ্রের স্বরূপ প্রকৃতির ব্যাপার কীটাণুদিগের বুদ্ধি এবং শক্তির অথবা চিন্তার অতীত বিষয় সত্য; কিন্তু সমুদ্রের জলই সে ঐ সকল কীটাণুর একই মাত্র জীবনের সুখের পদার্থ;—জল ছাড়া হলে তারা বাঁচে না, সেই জলই তাদের আধার, এই গুলিন বোধ কি তাদের নাই? সমুদ্রের কীটাণুর সমুদ্রের জলের প্রকৃতি,—বায়ু সাগরের কীটাণুর বায়ুসাগরের প্রকৃতি সকল তাদের সহস্র বুদ্ধি বা শক্তির পক্ষে অসীম অনন্ত ব্যাপার হইলেও,—দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার হইলেও,—তারা সমুদ্রের জলের ভাব,—বায়ুসাগরের বাতাসের ভাব, যেমন তাদের জীবনের প্রকৃতির সঙ্গে গাঁথা থাকে, সেই ভাবটুকু অনুভব করিতে অথবা চিন্তা করিতে যেমন তাহাদের অধিকার আছে; এবং সেই অধিকার থাকা যেমন তাহাদের প্রকৃতিমূলক; সেইরূপ ঈশ্বর অথবা মূলসত্য কিম্বা মূলকারণ বা মূলজ্ঞানশক্তি মানুষের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় হইলেও,, মানুষের আত্মার মধ্যে সেই সত্যের ভাব,—ঈশ্বরের ভাব যে সামান্য মাত্র আছে; মানব-প্রকৃতির সহিত যে ভাবটুকু গাঁথা রহিয়াছে, মানুষের আত্মার জীবন, যে সত্যের ভাবটুকু, যে টুকু চিন্তা করা মানব-প্রকৃতির অন্তর্গত (কীটাণুর পক্ষে জল সদৃশ,—সমুদ্র সদৃশ—বায়ুসাগর সদৃশ) ততটুকু মাত্র মূলসত্য, মূলকারণ, মূলশক্তি যাই কেন বল না, সে সম্বন্ধে যে অতি সামান্য মাত্র অধিকার আছে, অনুভবের শক্তি আছে, যে টুকুকে পর্য্যন্ত আলোচনা বা চিন্তা করা অনধিকার-চর্চ্চা কেমন করে বলা যাইতে পারে? কীটাণুর পক্ষে সমুদ্রের ব্যাপার—বায়ুসাগরের ব্যাপার দুর্জ্ঞেয় হইলেও যেমন জল, এবং বায়ুই তাহাদের জীবন বোধ থাকা, এবং

জলের ও বাতাসের ভাব তাহাদের প্রকৃতিতে রক্ষিত থাকা, কোন মতেই অযুক্তির কথা নহে, সেইরূপ মানুষের আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞান-শক্তি, অনন্ত সত্য, অনন্ত কারণত্ব প্রভৃতি সহস্র দুর্জ্ঞেয় হইলেও অনন্ত সত্যের ভাব,—অনন্ত কারণত্ব-ভাব,—অনন্ত জ্ঞানশক্তির ভাব যে অতি সামান্য মাত্র মানবাত্মাতে মিশ্রিত হয়ে আছে; সে টুকুকেও আলোচনা করা মানবাত্মার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা কোন্ প্রকার যুক্তিসিদ্ধ বলা যাইতে পারে? কীটাণুর পক্ষে জলের ভাব,—বায়ুর ভাব চিন্তা করা যেমন তাহাদের অধিকার-চর্চ্চার মধ্যে বলিতে হইবে,—সেইরূপ যত টুকু মূলকারণ, মূলশক্তি, মূলসত্যের ভাব মানব-প্রকৃতির আলোচনার অন্তর্গত, তাহা অতি যৎসামান্য হইলেও, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করা কেনই বা হইবে; বেশী পাব না বলে অল্পও পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেরূপ যুক্তি যে নিতান্ত ভুল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

আরও শুন, যদ্যপি মূলের অনুসন্ধান না পাইলে চুপ করে থাকা উচিত হয়, তা হলে আমরা যখন কোন বস্তুর অথবা পদার্থের মূল-নিয়ম জানিতে পারি না, তখন কোন বস্তুর নিয়ম অনুসন্ধান করা-তেই বা মানুষের অধিকার কি? গাছের পাতাতে এবং ফুলের পাকৃড়িতে নানারূপ রং হয়, কোন্ নিয়মে ঐ সকল রং হয়ে থাকে? অনুসন্ধান করে মানুষে জানিয়াছে, সূর্য্যের তেজে ঐ সকল রং আছে; সকল গাছপালা ফুল, কিম্বা সোণা, হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক প্রভৃতি ধাতুতে, অথবা চুনি, পান্না প্রভৃতি নানাজাতীয় পাথরের পরমাণুতে ঐ সূর্য্যের তেজ পতিত হইলে নানাজাতীয় রং প্রকাশ হইয়া থাকে। রং প্রকাশ হয় কি নিয়মে? মানুষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, ফুল, ফল, পাতা এবং সমস্ত ধাতু প্রভৃতিতে, কিম্বা জগতের অপর বস্তু বস্তু আছে, তাহাতে যে লাল, নীল, সৌবজে, হল্‌দে প্রভৃতি সাত প্রকার রং হয়ে থাকে, তাহার কারণ এই যে,

পৃথিবীতে যত প্রকার পরমাণু আছে, সেই সব পরমাণুর দুই রূপ শক্তি আছে, একটী শক্তিতে তাড়াইয়া দেয়, অপরটীতে টানিয়া গ্রহণ করে, সেই নিয়মে যে বস্তুর পরমাণু যে যে সূর্য্যকিরণের রংকে (১) তাড়াইয়া দেয়, সেই সেই রং ফল, পুষ্প, ধাতু প্রভৃতির উপরে ভাসিয়া উঠে, আর যে রং গুলি আপনাদের ভিতরে গ্রহণ করে, তাহা আর প্রকাশ হয় না; যদ্যপি দুই তিনটী রংকে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে ফুল, পাতা, ফল, ধাতু প্রভৃতির এমন কি জীবজন্তুর পালক, শরীর নানা মিশ্র বর্ণের রঙে রঞ্জিত হয়ে থাকে, যদ্যপি সকল প্রকার রং ঐ সকল ফল, ফুল, ধাতু, পাতা, শরীর প্রভৃতির পরমাণু ভিতরে টানিয়া লয়, তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থের শাদা রং হয়ে থাকে, অর্থাৎ স্বাভাবিক রং প্রকাশ পায়; এই তো নিয়ম জানা হইল; কিন্তু কি মূল নিয়মে সূর্য্যের তেজে রং হয়,—কি মূল নিয়মে একই রূপ বস্তু বা পাতা ফুল প্রভৃতি এক সময়ে এক রূপ অন্য অবস্থাতে ভিন্ন রূপ তেজঃগ্রহণ করে, কোন্ নিয়মে পরমাণুর ঈদৃশ স্বভাব উপস্থিত হয়, তা তো জানা যায় না, তখন নিয়মের অনুসন্ধান তো করা হইতে পারে না। মূলকারণের সকল বিষয় জানা যায় না বলে, যদ্যপি তাঁর আলোচনা পর্য্যন্ত করা অনুচিত হয়, তাহা হইলে, মূলনিয়ম সকল যখন কিছুই জানিবার যো নাই. তখন নিয়ম সকল অনুসন্ধান করা হইতে পারে না তো?

মা। ওমা! এর ভিতরে এত কথা?

দ। শুন, কারণ অনুসন্ধান করা মানুষের প্রকৃতি। সকল কার্য্যের মূলতত্ত্ব অথবা মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে প্রত্যেক

---

(১) তিন প্রকার খাঁটি রং অর্থাৎ লাল, নীল, হলদে. এই তিনটী আসল, অপর কএকটী মিশ্র রং সূর্য্যের কিরণেই আছে।

মানুষের ভিতরে একটী ঝোঁক আছে, তাহা তুমি জান তো? যেমন একটী ভারি বস্তু সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দিলে, যত ক্ষণ সেই ভারি বস্তুটী সমুদ্রের তলায় গিয়ে না ঠেকে, তত ক্ষণ তাহার গতি যেমন বন্ধ হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে কারণ অনুসন্ধানের একটী ইচ্ছা অথবা ভাব আছে, যে পর্য্যন্ত সেই ইচ্ছা অথবা ভাবটী সেই কারণের মূলে গিয়া না উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃতি অনুসন্ধানে কদাচই নিবৃত্তি হয় না। মানুষের সেই প্রকৃতি অথবা সহজ-স্বভাব একেবারে লোপ না হলে তো "কারণ অনুসন্ধানে নিবৃত্তি হও" এই বলিলেই তো আর মানুষ সঙ্গের সঙ্গী প্রকৃতি অথবা স্বভাবকে তাড়ায়ে দিয়ে কারণ অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হতে পাবে না? যে কার্য্যই কেন হউক না, মানুষ যত ক্ষণ সেই কার্য্যের মূল কারণ কি;—যে কোন ঘটনাই কেন হউক না,—সেই ঘটনার মূল কারণ কি, আসল কারণ কি, যত ক্ষণ সেটী না জানিতে পারে, তত ক্ষণ মানুষের প্রাণের ভিতরে হাঁপাই হাঁপাই কর্‌তে থাকে— মনের ভিতর উস্‌খুস্ কর্‌তে থাকে, মানুষ জাতির প্রকৃতিই এই, স্বভাবই এই, ভাব কি বল দেখি? যেমন প্রত্যেক মানুষের ক্ষুধা আছে, মানুষ মাত্রেরই ক্ষুধা থাকা একেবারে প্রকৃতি, অথবা স্বভাবই বল। ক্ষুধা নাই, অথচ মানুষ আছে, এমন প্রকৃতির একটাও মানুষ দেখাতে পার? যেমন তাহা দেখা যায় না, ক্ষুধা থাকা যেমন মানুষের স্বভাব, অথবা প্রকৃতি; সেইরূপ ক্ষুধা থাকিলেই খাইতে চাওয়া, খাবার অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছাটীও প্রত্যেক মানুষের স্বভাবসিদ্ধ অথবা প্রকৃতিমূলক, সেই রূপ প্রত্যেক মানুষের সকল প্রকার কার্য্যের অথবা ঘটনার মূল কারণ—মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করার ইচ্ছাটী একেবারে মানব প্রকৃতি অথবা স্বভাবের সঙ্গে মাখামাখি করা আছে; এখন মনুষ্য-জীবনের প্রকৃতি অথবা স্বভাবকে ছাড়িবে কেমন করে? যেমন মানুষ ক্ষুধার প্রকৃতি অথবা স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্য

করিতে চিরকাল সক্ষম হয় না, সেই রূপ মানুষের মধ্যে কারণ অনু-সন্ধানের স্বভাব অথবা প্রকৃতি যাহা আছে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারে না; তবে এই মাত্র জানা যায়, অবস্থা বিশেষে, মানুষ বিশেষে ক্ষুধা কম বেশী যেমন থাকিতে পারে, সেই রূপ অবস্থা বিশেষে মানুষ বিশেষে কারণ অনুসন্ধানের প্রকৃতি অথবা স্বভাব দুর্ব্বল এবং সবল থাকিতে পারে। যেমন পেট্‌রোগা দুর্ব্বলের ক্ষুধা কম, এবং বলিষ্ঠের ক্ষুধা বেশী হয়ে থাকে, সেই রূপ অল্পজ্ঞানীদের কারণ অনুসন্ধান ইচ্ছাটী অল্প এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কারণ অনুসন্ধান ইচ্ছাটী প্রবলতর, এইমাত্র জানা যায়। মানুষের ক্ষুধা একেবারে নাই, এটী যেমন হতে পারে না, সেই রূপ যদি কেহ বলেন, কোন মানুষের কারণ জিজ্ঞাসার প্রকৃতি অথবা স্বভাব আদৌ নাই, সেটীও সেই রূপ মিথ্যা কথা।

মা। কেন বল? আমার তো কোন কোন দিন আদৌ ক্ষিদে থাকে না?

দ। তাই বলে তোমার ক্ষুধা কিছুই নাই, একেবারে ধুয়ে পুঁছে যাওয়া ধর্‌তে হবে না কি? কারণ অনুসন্ধান করা যে মানুষের স্বভাব, অথবা প্রকৃতি তাহার একটী উদাহরণ দেখ;—যখন ছদের ছেলেরা আদু আদু কথা বলিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে তাদের ভিতরে জ্ঞান যেমন আপনা আপনি বাড়্‌তে চেষ্টা করে বলেই তাদের পিতা মাতাকে "এ টা কি? সে টা কি? ও টা কি?" সারাখুণ্ডি জিজ্ঞাসা কর্‌তে থাকে; সেই ছেলেরা কি খেতে কি যেতে, কি গল্প শুন্‌তে সকল সময়েই "কেন? কেন? কেন?" বলে সকল কথারই কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা কর্‌তে থাকে; যত ক্ষণ তাহারা একটী আপনার বিশ্বাসজনক কারণ জানিতে না পারে, তত ক্ষণ সেই সব ছেলেরা মা বাপ্‌কে এবং আত্মীয় স্বজনকে ক্যাচাখেগো কর্‌তে থাকে; বিশ্বাসজনক কারণ জানিতে পারিলে তবে চুপ্

মারে। ক্রমে তারা ছেলে মানুষ ঘুচে ডাগর ডোগর যত হতে থাকে, তখন যেমন তাদের স্বাভাবিক নিয়মে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে উঠে, সেইরূপ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই কারণ জানিবার ইচ্ছাটী বাড়িয়া উঠে, এইটী প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করে বল দেখি, কারণ জানিবার ইচ্ছাটী মানুষের স্বাভাবিক অথবা প্রকৃতিমূলক কি না?

মা। তা তো বুঝতেই পারছি।

দ। তবে যাঁরা বলেন, কারণ অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে চুপ মেরে কাজ কর্ম্ম করে হেসে খেলে দিন কাটাও, তাঁরা কি মানুষের প্রকৃতি অথবা স্বভাবকে একেবারে উল্টে দিতে চান? তা ইচ্ছা করলে কি হবে? স্বভাব এবং প্রকৃতিকে কেহ কি একেবারে নিপাট করতে পারেন? যেমন চূণেহলুদে মিশুলে রাঙা রং হবেই হবে, যে প্রকৃতি যেমন কেহই হাত দিয়া রক্ষা করিতে পারেন না, তখন মানুষের কারণ অনুসন্ধানের প্রকৃতি যাহা মানুষ মাত্রেরই জীবনের সঙ্গে গাঁথা আছে, সে প্রকৃতি অথবা স্বভাবকে উড়াইয়া দিতে কিরূপে পারা যায়?

মা। তাঁরা বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষের যখন কারণ বুঝিবার শক্তি নাই, আর নিয়ম দেখলেই সব কাজকর্ম্ম চলে, সব আবশ্যকীয় বিষয় জানা যায়;—যেমন মেঘ হলেই বৃষ্টি হয়ে থাকে, বর্ষার পরেই শীত হয়,—দুধ খেলেই গায়ে রক্ত হয়, রক্ত বেশী হলেই শক্তি বাড়ে, এইরূপ জগতের নিয়ম পড়ে আছে। "কেন এ সকল হয়, কোন্ কারণ হতে এ সকল নিয়ম হয়েছে, এ সব নিয়মে কি মঙ্গল ভাব, মঙ্গল অভিপ্রায় আছে, সে সব জানিবার মানুষের আবশ্যক করে না।"

দ। আচ্ছা, মায়া! তুমি জান তো, "কেন, কি জন্য, কি নিমিত্ত, কি হেতু, কি কারণ" এই শব্দগুলির অর্থ কি? ঐ শব্দগুলিকে, কারণ অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশের শব্দ বলা যায় কি না?

আর ভাষার সৃষ্টি, যখন মানুষ অতি সামান্য জ্ঞানী, অপরিষ্কৃত-বুদ্ধি ছিলেন, কোন পুস্তকাদি ছিল না, সেই সময় থেকে হয় কি না?

মা। তাই হল, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে?

দ। তা হলে অসভ্য অবস্থা হইতেই ভাষার সৃষ্টি হইতে মানুষের, মনের ভাব প্রকৃতি প্রকাশ হইবার সময় হইতেই কার অনুসন্ধান করা যে, মানুষের প্রকৃতিগত,—উটি যে সভ্যতার ফল নহে উটি যে জ্ঞানবৃদ্ধির ফল নহে, তাহা স্পষ্টই প্রমাণ হতেছে। ভাল যাঁরা কারণ অনুসন্ধান করিতে নিবারণ করেন, তাঁরা নিজে নিজে দরকারের সময় ঐ শব্দ গুলিন ব্যবহার করেন কি না?

মা। তা যদি করেনই, তাতে কি দোষ পড়ে?

দ। ঐ শব্দগুলি সবই কারণ অনুসন্ধানের ইচ্ছা-প্রকাশক মাত্র যদ্যপি তাঁরা একটাও কারণ অনুসন্ধান করার বিষয়ে মানুষের অধিকার থাকা স্বীকার করেন, তা হলে দশটী কারণ অনুসন্ধানের অধিকার নাই, কোন্ যুক্তিতে দেখাইতে পারিবেন? তা হলে "মানুষের কারণ অনুসন্ধান করা অনধিকার-চর্চ্চা" এরূপ আপত্তি তো একেবারেই কাটিয়া যাইবে; যদ্যপি একজনের পক্ষে একটী থাকে, তা হলে অন্যের পক্ষে পাঁচটী না থাক্‌বার কারণ কি?

মা। তাঁরা বলেন, ক্ষুদে ক্ষুদে কারণ অনুসন্ধান কর্‌লেও তাঁদের বিশেষ আপত্তি নাই। কেবল মাত্র সেই মূলকারণকে জানিবার চেষ্টা করা বা সে কারণের নাম উচ্চারণ করাও দরকার নাই?

সরস্বতী। যত দোষ নন্দঘোষ বুঝি? কেবল "দশার বেটার নাম করতে নাই" এই বুঝি ফন্দী?

দ। তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, কারণ অনুসন্ধান করা মানুষের স্বভাবে গাঁথা,—মানব প্রকৃতিতে গাঁথা; সেই কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গিয়ে, যত ক্ষণ আহার মূলের নিকটে না গিয়ে উপস্থিত হয়, তত ক্ষণ মানুষের প্রকৃতি মধ্যপথে কখনই স্থির থাকিতে

পারে না, ইহাও মানুষের স্বভাব, এবং প্রকৃতি। স্বভাবের সাক্ষী প্রকৃতির খাঁটি প্রমাণ, বালকের হৃদয়েই স্পষ্ট পাওয়া যায়; অসভ্য অবস্থাতেও পাওয়া যায়; এখন তারই একটী উদাহরণ শুন;— গোরুকে মাঠে চরাইতে নিয়ে যাবার সময়ে বালকের মাতার হাত ধরে মার মুখপানে চেয়ে, আহ্ আহ্ স্বরে স্নেহময়ী প্রফুল্লমুখী মাতাকে সেই বালক ছেলেটী জিজ্ঞাসা করিতেছে;—

বালক। মা! ও সব কি?

মাতা। গোরু।

বা। ওরা কোথা যাবে?

মা। মাঠে।

বা। মাঠে কেন্ যাবে?

মা। চরে ঘাস খেতে।

বা। ঘাস খাবে কেন?

মা। ক্ষিদে পায় বলে?

বা। ক্ষিদে পায় কেন?

মা। যার শরীর আছে, পেট আছে, তার ক্ষিদে পেয়ে থাকে?

বা। যার শরীর আছে, পেট আছে, তার ক্ষিদে পায় কেন?

মা। রক্ত হবে বলে।

বা। রক্ত হয় কেন?

মা। শরীর ডাগোর হবে বলে।

বা। শরীর ডাগোর হয় কেন?

মা। তা হয়ে থাকে।

বা। তা হয় কেন?

মা। ঈশ্বরই জানেন; যিনি শরীর দেছেন সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরই জানেন; আমাদের মঙ্গলের জন্যই এই নিয়ম করে দেছেন।

স্ব। এই স্পষ্টই দেখ, যত ক্ষণ ছেলেটী সেই মূল কারণের কাছে

না গেল, তার কারণ জিজ্ঞাসা, কারণ অনুসন্ধান ইচ্ছাটী নিবৃত্তি হল না; এইরূপ সব জেন।

মা। “মূলকারণ”তো ঈশ্বর? তা সেই ঈশ্বরের বিষয় যখন কিছুই বুঝা যায় না, তখন তাঁর কথা নিয়ে আন্দোলন কর্‌বার দরকার কি? ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষ সেই প্রাচীন কালে যাহা জানিত, এখনও তাহাই জানিতেছে, কোন বিষয়ে সেই ঈশ্বরতত্ত্ব—মূল কারণ-তত্ত্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা বেশী এক টুকুও অদ্যাপি জানিতে পারিল না, এবং পারিবারও সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁর বিষয় নিয়ে মিছে আন্দোলনের প্রয়োজন কি?

দ। ও কথার তো জবাব দেওয়া হয়েছে। তা আচ্ছা, আরও তোমাকে পরিষ্কার করে বল্‌ছি; মানুষের মাতার স্নেহ, মমতা, দয়া, যত্ন সেই পূর্ব্বকালের অসভ্য অবস্থাতে যাহা ছিল, তার পরে যত প্রাচীন ইতিহাস পৃথিবীতে আছে তাহাতেও যেরূপ শুনা যায়, এখনও তো ঠিক একই রূপ দেখা যায়, জানা যায়, এখনকার মাতাদের তো সে কালের মাতাদের অপেক্ষা কিছুই স্নেহ, মমতা, দয়া, বেশী জানা যায় না, শুনা যায় না, তখন এখনকার মাতাদের স্নেহ, মমতা, দয়ার চিন্তা কর্‌বার দরকার কি?

মা। ও তো ফাঁকির কথা গেল, আসল কথার জবাব দাও?

দ। আচ্ছা, সমুদ্রে যে সব কীটাণু আছে, তারা কোন কালে সমুদ্রের পরিমাণ জানিবার যো নাই, তাই বলে তারা সমুদ্রে আছে, সমুদ্রের জলই তাদের জীবন, একিও তারা জানে না? ঈশ্বরবিষয়ই বল, আর মূল কারণ বিষয়ই বল, তাঁর বিষয় মানুষ একেবারে কিছুই জানে না, বা জানিতে অধিকার নাই এমত নহে, সামান্য ক্ষুদ্র জ্ঞানী মানুষে তাঁর বিষয় সকল কোন কালে জানিতে পারেও নাই, জানিতে পারিবার অধিকারও দেখা যায় না, তাই বলে, যে একরত্তি অতি সামান্য আভাস মাত্র যাহা স্পষ্টরূপে

মানুষের জ্ঞানের নিকটে প্রকাশিত আছে, সে টুকুকেও ছাড়িয়া দিবার আবশ্যক কি? এই পৃথিবী জ্ঞান এবং বিদ্যার অকূলসাগর বিশেষ, এই পৃথিবীতে যত বই পুথি পাঁজী শাস্ত্র অদ্যাবধি প্রকাশ হয়েছে, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, জগতের জ্ঞানের নিকটে ও সব এক মুষ্টি বালু-কণাও হবে না; তখন জ্ঞান, বিদ্যারও তো কূল-কিনারা নাই, তা হলে জ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চা করাও তো হতে পারে না? এক জন মানুষ পৃথিবীর সকল পুস্তক, সকল শাস্ত্র, সকল বিদ্যা শিক্ষা করতে পারেন কি? তা তো কদাচই পারেন না; সকল বিদ্যা শিক্ষা করতে পারেন না বলে, যে টুকু শিক্ষা করা যায়, সে টুকুতেও কি শিক্ষা করতে ক্ষান্ত থাকতে হবে না কি? যাঁরা "বিজ্ঞান! বিজ্ঞান!" করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা কর দেখি, বিজ্ঞান বিষয়ের কি অন্ত আছে? অথবা কোন কালেও কি মানুষে বিজ্ঞানরূপ সাগরের মূলে যাইতে পারিবেন? অথবা বিজ্ঞানের এক সিকির সিকি তস্য সিকি জানিয়া শেষ করিতে পারিবেন? তখন যে বিজ্ঞানের অন্ত নাই, অনন্ত কালেও যে বিজ্ঞানের মূলে কোন মানুষই যাইবার অধিকার নাই বলে বিশ্বাস করিতে হয়, তাঁরা জেনে শুনে যাহার অন্ত নাই সে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন কেন? সে সময়ে অনধিকার বিষয়ে অধিকার খাটান কেমন করে? এই যে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলের বিষয় মানুষের জ্ঞানের অতীত বিষয় বলা যাইতে পারে, তখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ জেনে শুনে অনধিকার-চর্চ্চা করেন কেন? যেমন ঐ বিজ্ঞান বিষয়কে অনন্ত ব্যাপার জানিয়াও কোন কালেই তাঁরা বিজ্ঞান-সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে ডুবিতে পারিবেন না জানিয়াও, যত টুকু জানা যায়, যত টুকু মানব-জ্ঞানের আয়ত্তাধীন, কেবল মাত্র সেই বিজ্ঞান টুকু লাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা যত্ন আয়াস করেন, যে একটুকু একটুকু ফল লাভ করিয়া আপনাদের

মনঃপ্রবৃত্তি সকলকে উন্নত এবং চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতেছেন, তখন সেই রূপ ঈশ্বর সহস্র অগম্য অপার হইলেও,—সেই অনাদি অনন্ত মূলকারণ-সইশ্বর মানব-জ্ঞানের অতীত হইলেও, মানুষ তাঁহার মঙ্গলময় ভাব যে টুকু জানিতে পারিবার অধিকার পাইয়াছেন, সে অতি যৎসামান্য হইলেও, বেশী জানা যায় না বলে, সেই যৎসামান্য টুকুকেও ছাড়িয়া তাহার আলোচনাশূন্য হইয়া থাকিতে হইবে, ইহারই বা কারণ কি? দুঃখীর বেশী সোণা নাই, তাই বলে যদি তার এক সরিষার মতন পাত্‌ঝিঁজির সোণা থাকে, সে টুকুকে কি বেশী নাই বলে ফেলে দিবার ব্যবস্থা চলে থাকে? না সে ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত? অনন্ত বিজ্ঞান-সাগরের কিনারায় বসে গণ্ডাকত কাঁকর গণিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যেরূপ সুখী এবং আনন্দিত হয়ে থাকেন, সেই রূপ ঈশ্বর অথবা মূলকারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে টুকু জানা যায়, এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উপাদান সকলের সহিত সেই মূলকারণের মঙ্গলময় শুভফলপ্রদ যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার যত টুকু মানুষের জানিবার অধিকার আছে, কেবল মাত্র সেই টুকু জেনে, সেই টুকু আলোচনা করে, সেই টুকুর অনুসন্ধান করে যে সুখ টুকু মানুষে পাইতে পারে, এবং যে সুখ টুকু পাইবার মানুষ সম্পূর্ণ অধিকারী, একেবারে তাঁহার আলোচনা শূন্য হয়ে, সেই নির্ম্মল সুখ টুকু লাভ করিতে কেনই বা বঞ্চিত হইবেন? যদ্যপি জ্ঞানের চর্চ্চাতে জ্ঞানের উন্নতি হতে পারে,—বিদ্যার চর্চ্চাতে বিদ্যার উন্নতি হতে পারে, শিল্পকর্ম্মের চর্চ্চাতে শিল্পকর্ম্মের উন্নতি হতে পারে, এ তো স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন ঐ সকল বিষয়ের সহিত মূল-কারণের মঙ্গলময় ভাবের সংযোগের তত্ত্বানুসন্ধান করে, মানুষের হৃদয়ে প্রেমভক্তি, দয়া, করুণা, পবিত্রতা, মঙ্গলভাব, বিবেক প্রভৃতি উন্নত না হইবার কারণ কি?

মা। আচ্ছা, সাধু সজ্জন প্রভৃতি ভাল ভাল লোককে, এবং

মাতা, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতিকে স্নেহ ভক্তি প্রেম প্রভৃতি প্রদান করে, ঐ সকল প্রবৃত্তি যখন উন্নত হইতে পারে, তখন তা না করে যাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁকে প্রেমভক্তি অর্পণ কর্‌তে গিয়ে বৃথা গণ্ড-গোল করার দরকার কি?

দ। পৃথিবীর মানুষকে আদর্শ করে প্রেমভক্তি বাড়াইতে গেলে সর্ব্বনাশ হইবারই সম্ভাবনা! মানুষকে মানুষ যদি জীবনের আদর্শ করেন, তা হলে সেই আদর্শ মানুষের মধ্যে যে সব পাপ, দুর্ব্বলতা, অভাব, সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, ভ্রম প্রভৃতি যত প্রকার ক্ষুদ্রভাব দেখা যাইবে, অগ্রে তাহারই প্রতি নজর পড়িবে, এবং সেই আদর্শের কলঙ্ক আসিয়া তাহার হৃদয়কেও পর্য্যন্ত নষ্ট করিবে; এই জন্য অনেক গুরুর দোষ; অনেক শিষ্য পাইয়াছেন; ঐ জন্য অনেক বৈষ্ণব,—ঐ জন্য অনেক মুসলমান কিরূপ বিকৃত-স্বভাব হয়ে গেছেন, তা তো স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছ? যদ্যপি কেহ একটী ঘটী কিম্বা গাড়ু দেখেন, সেই আদর্শেই সকল বিজ্ঞানের উন্নতি কর্‌তে চেষ্টা করেন, তাতে যেমন তাঁর বিজ্ঞানের উন্নতি হবার সম্ভাবনা, সেই রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবাত্মাকে আদর্শ করে, প্রেম, ভক্তি, প্রীতি, সত্য-নিষ্ঠা, ন্যায়, দয়া প্রভৃতির উন্নতি সাধন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে ঐ রূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ উন্নতির কোন আশাই নাই; "যেমন গুরু তেমনি চেলা" হয়ে যায়,—অসীম শক্তিকে, অসীম দয়াকে, অসীম প্রেমসাগরকে, অসীম জগৎব্যাপী পূর্ণসত্যকে, অনন্ত মঙ্গলময়কে জীবনের আদর্শ না রাখ্‌লে, মানুষের সাধ্য কি যে ইহলোকে জীবনকে উন্নত করাইতে পারেন?

মা। যদি মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করে, তা হলে একটী ঘটী আর একটী গাড়ু থেকেই বিজ্ঞানের সকল অনুসন্ধানই বুঝ্‌তে পারেন। তুমি যা এই ক্ষুদ্র বলে হেয়জ্ঞান কর্‌লে, কিন্তু মানুষ যদি বুদ্ধিচালনা কর্‌তে পারেন, তা হলে একটী মাত্র সামান্য পদার্থ

দেখে, জগতের সমস্ত সৃষ্টিকৌশল সেই বস্তুর মধ্যেই এক সঙ্গে সব জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই কি মনে কর?

দ। সেই রূপ যদ্যপি এক জন মানুষ অপর এক জন সামান্য মানুষের প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, জ্ঞান, মঙ্গল-সঙ্কল্প প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারেন, তাঁর দোষের দিকে দৃষ্টি যদি আদৌ না যায়, তা হলে সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের সকল ভাবই মানুষের হৃদয়ে, মানুষ দেখ্‌তে পাইতে পারে; কিন্তু কাজে কি তা হয়?

মা। আচ্ছা দয়া! কারণকে ছেড়ে, নিয়ম কি থাকৃতে পারে না?

দ। নিয়ম কথাটী বলিবা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে নিয়মকর্ত্তা উপস্থিত হয়ে পড়েন; সেটী তো পূর্ব্বে বলা হয়েছে; আরও তোমাকে একটু সে বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে দিতেছি। আচ্ছা বল দেখি,—তুমি যখন একখানি ভাল কেতাব পড়; সেই কেতাব-লেখকের সঙ্গে তোমার কোন কালে আলাপ না থাকিলেও, কোন কালে তোমার সঙ্গে দেখা শুনা হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, এমন কি কস্মিন্‌কালে তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হইবার আশাটী পর্য্যন্ত না থাকিলেও, তাঁর কত গুণ, কত বিদ্যা জানিতে না পারিলেও কেবল মাত্র সেই কেতাব খানির যত টুকু পড়, তারই মধ্যে যত টুকু ভাল বিষয় জানিতে পার, সেই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বইলেখককে তোমার মনে পড়ে কি না?

মা। তা তো নিশ্চয়ই পড়ে থাকে।

দ। এমন যদি হয়, কস্মিন্‌কালে তাঁর সহিত আলাপ পরিচয় করার সম্ভাবনা নাই, আশাও নাই, তাঁর অপর আচরণ বা চরিত্রগত ব্যাপার কিছুই অনুসন্ধান পাবার যো নাই, আর তাঁহার কৃত যত বই আছে, তুমি একশ বছর যত্ন করিলেও বুঝে বা পড়ে করে উঠ্‌তে পার্‌বে না, এবং তাহা তোমার জানিবার ক্ষমতা যদি একে-

থারেই না থাকে, তা হইলে তুমি তাঁহার কৃত অনেক কেতাবের মধ্যে এক আদ খানি কেতাবের কিছু কিছু সামান্য মাত্র যদি পড়ে তোমার ভাল বোধ হয়, আর ভারী মিষ্টি লাগে, তখন তুমি সেই বইলেখককে কি ভাল লোক বলে মনে কর না? তাঁর কৃত পুস্তকের বিষয় একটু পড়িতে পড়িতে সেই পুস্তকে তাঁর যে সকল মনের ভাব প্রকাশ আছে, সেই ভাব সকল আলোচনা করে, তাঁর গুণ জ্ঞান বিষয়ে যতটুকু তোমার বোধগম্য হয়, সেই টকুও কি তোমার চিন্তা করিবার অধিকার নাই? কিম্বা পড়িতে পড়িতে তাঁকে কি প্রশংসা কর না? তাঁকে প্রশংসা না করে, সেই পুস্তক যত টুকু বুঝিতে পারিলে, সেই টুকু বুঝেই চুপ চাপ মেরে থাকতে পার কি?

মা। তাও কি কখন হয়ে থাকে? তাঁর সঙ্গে সহস্র আলাপ না থাক্‌লেও যতটুকু বুঝ্‌তে পারি, তাতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আপনা হতেই উথলে উঠে।

দ। তবে বল দেখি, এই জগৎ সংসারের যত মঙ্গল নিয়ম যাঁর সৃষ্টি,—যত বিজ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিতগণকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই মূলকারণ, সেই মূলনিয়ন্তার সঙ্গে কখনও আমাদের চর্ম্মচক্ষে দেখা হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও কেবল মাত্র জগতের অনন্ত নিয়মের সঙ্গে সেই অনন্ত মঙ্গলময় নিয়ন্তার যে টুকু সত্তা এবং সম্বন্ধ অনুভব করা যাইতে পারে, কেবল মাত্র সেই টুকুই অবলম্বন করে (ঐ বইলেখকের মতনও কি) ঐ মূলকারণকে, মূল-নিয়ন্তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করা যাইতে পারে না? অথবা তাঁর অনন্ত মঙ্গল ভাবের বিষয় চিন্তা করা যায় না?

মা। এই পৃথিবীর মঙ্গল নিয়ম সকল,—জগতের সুন্দর কাণ্ড সকল চক্ষে পড়্‌বা মাত্রই,—চিন্তার উদয় হবা মাত্রই, সেই মূল-নিয়ন্তার প্রতি—মূল কারণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আপনা আপনিই

অলক্ষিত ভাবে দৌড়ে যায়, তা কি আর কোন বিজ্ঞান শাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন পণ্ডিত হাত দিয়ে রাখ্‌তে পারেন? সত্যের ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি যাহা আপনা হতেই হৃদয় থেকে উথ্‌লে উঠে, তা কি কেউ বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারে?

দ। আরও তোমাকে একটী উদাহরণ দিই,—বেদবিধির বিষয় মনে হলেই, যেমন সেই সকল শাস্ত্রের স্রষ্টা মুনিঋষিদিগকে মনে পড়ে যায়, সেইরূপ মনে পড়াকে যেমন কোন তর্ক শাস্ত্র অথবা যুক্তি বাধা দিতে পারে না, তেম্‌নি শরীরের নিয়ম, মনের নিয়ম, প্রবৃত্তি সকলের নিয়ম, বুদ্ধির নিয়ম, মরা বাঁচার নিয়ম, শান্তিসুখের নিয়ম, দিনরাত্রের নিয়ম, শীত গ্রীষ্ম বর্ষার নিয়ম, কালের নিয়ম, মেঘ বৃষ্টি বাতাস বিদ্যুৎ প্রভৃতির নিয়ম, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতির নিয়ম, মানুষের মধ্যে স্নেহ, অনুরাগ, দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেক, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মানুরাগ, নিস্বার্থতা, বুদ্ধিচালনা, জ্ঞানচালনা প্রভৃতির নিয়ম, এই যতপ্রকার নিয়ম মানুষের জ্ঞানের গোচর হয়ে থাকে, সেই সকল নিয়ম আলোচনা করিবা মাত্র ঐ সকল নিয়মের স্রষ্টাকে অথবা তাহার মূল-কারণকে তখনই স্মরণ হইয়া পড়ে, কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রই, তর্ক শাস্ত্রই সেই স্মরণ-পথে বাধা দিতে পারে না। যেটী মানুষের প্রকৃতি অথবা স্বভাব, তাহার আগমন-পথ রোধ করিতে পারে কি? স্বভাবের প্রতিকূলে অথবা অনুকূলে কার্য্য করিতে সেই স্বভাবই পারে, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতিকূলে মানুষের কোনরূপ প্রকৃতি অথবা স্বভাব আছে কি? মনোরাজ্য ঘুঁটে কেউ তেমন স্বভাব এক টুকুও বার্‌ কর দেখি? কি আশ্চর্য্যের কথা, খেতে, শুতে, নিতে, যেতে, রোগে, সকল সময়েই যে কোন নিয়মই আছে, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করা হবে, অথচ বলা হবে, কারণ অনুসন্ধান করে ফল নাই,—অনুসন্ধানে কাজ নাই, এরূপ মানুষের স্বভাবের বিরুদ্ধে, মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা কি আব্‌দারের কথা বলা যায় না?

স। ও বন! বাঁশ-বাগানে ডোম কানা! অনেক বিদ্যা হলে বিদ্যা ভূড়ভুড়ি কেটে উঠে! ও বন! যে ভাল গেরাপ্ খেলতে পারে, সে এক এক সময়ে কাগজ ভেস্তে ফেলে;—যে ভাল রাঁদনীকে অনেক রাদ্‌তে হয়, তিনি এক আদ্‌টা তরকারিকে নুনে বোড়ার বিষ করে ফেলেন; যাকে অনেক পট আঁকিতে হয়, সে হয় তো কখন কখন তাড়াতাড়ি ঘুমের ঘোরে সিঙ্গীর গোঁপ আকৃতে গিয়ে মা দুর্গার গোঁপ এঁকে ফেলে! সেই রূপ যাঁকে অনেক বই বা শাস্ত্র লিখ্‌তে হয়, তাঁরা হয় তো অনেক সময়ে আপ্‌নার অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিয়ে বসেন;—পণ্ডিত চিন্তাশীল ব্যক্তি কাঁদে গাম্‌ছা রেখে, সৃষ্টিময় গামছা খুজে, দেখ্‌তে পান না, এও বুঝি তাই ঘটেছে?"

মা। আচ্ছা দয়া! তুমি পূর্ব্বে বলেছিলে কোমত সাহেবের মতের সঙ্গে, তাঁর জীবনের ব্যবহার উলটো হয়েছিল, তা সে কি রূপ?

দ। তিনি শেষে নরপূজক হতে ব্যবস্থা দিয়ে গিয়াছিলেন, তিনি অনেক বই লিখে, শেষে দেখেন, মানুষের মধ্যে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ এই সব উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, সে গুলির উপায় কি হবে ভেবে, সে গুলি ছাড়া হলে, মানুষ পশুর বেহেদ্দ হয়ে যাবে, এই ভেবে, মাকে ভক্তি, স্ত্রীকে প্রেম, কন্যাকে স্নেহ, অর্পণ করে তাঁদেরই পূজা করতে ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। স্ত্রী, কন্যা, মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জেনে পূজার ব্যবস্থা দেছেন। ঐ তিন জনকে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ দিয়ে পূজা করলেই মানব-জীবনের সদ্বৃত্তি সকল রক্ষা পাইবে এই বলে গেছেন; তা হলে তিনি নরপূজক ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে?

মা। তা তিনিও তো মানুষ? মানুষের প্রকৃতি, স্বভাব কোন রূপ পূজা না করে থাকৃতে পারে না; সেইটীর প্রকাশ্য ফল ঐ?

দ। ঐটী তাঁর ভারী ভুল কথা; এবং সঙ্কীর্ণ মত। মানুষ কখন কি মানুষের জীবনের আদর্শ হতে পারে? তিনি প্রকাণ্ড জ্ঞানী

লোক হয়েও এইখানে একেবারে গুব্‌ড়ে গেছেন, একেবারে ছেলে মানুষীর এক শেষ প্রকাশ করে গেছেন;—মানব-জীবনের বিশেষ ভ্রম এবং অল্পজ্ঞানতার পরিচয় এইখানে দিয়ে গেছেন; মাতা যদ্যপি কুপথগামিনী হন, স্ত্রী যদ্যপি কুপথগামিনী হন,—কন্যা যদ্যপি কুপথ-গামিনী হন, তা হলে তাঁদের প্রতি কি প্রেম, ভক্তি, স্নেহ থাক্‌তে পারে? তেমন স্থানে মা, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতিকে ঐ সকল প্রেম, ভক্তি, স্নেহ চরিতার্থের আধার কেমন করে করা যাইবে? এমন কি মানুষের মধ্যে কোন না কোন দোষ থাকিবেই থাকিবে, তখন সেই সব দোষ প্রকাশ হইলে তখন তাঁদের প্রতি প্রেম, ভক্তি, স্নেহ না গিয়ে, ভক্তির স্থানে অভক্তি,—প্রেমের স্থানে অপ্রেম, স্নেহের স্থানে অস্নেহ কিম্বা শুষ্কভাব হইবেই হইবে, সে মানব-প্রকৃতি অথবা মানব-স্বভাবের স্বধর্ম্ম; তা হলে ভক্তি, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি চরিতার্থের উপায় কি? যদ্যপি ঐ তিনটীর একটী আদর্শের কোন গোলমাল ঘটে, তা হলে, সেই আদর্শের অভাব জন্য সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, তা হলে মানব-জীবনের গৌরব ঐ খানেই যে বিনষ্ট হয়ে যাবে, তার কি বল দেখি? মানুষকে আদর্শ করতে গেলে, ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বনাশ, সদ্বৃত্তি সকলের মাথা মুড়ান হইবে যে? এই খানেই কোমত সাহেব জ্ঞান বুদ্ধির পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে গেছেন; তাঁর সুন্দর অঙ্গ এই খানেই আর আসল একস্থানেই ভ্রম-কাদাতে মাখামাখি হয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ সত্যভক্ত লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার এই কথাতেও প্রকাশ পাইয়াছে; যখন যেটী সত্য দেখ্‌তে পাইতেন, সেইটী অকুতোভয়ে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করতেন না; তিনি ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি মানুষের সদ্বৃত্তি সকল চরিতার্থের আদর্শের আবশ্যকতা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখনই তিনি আপনাকে পৌত্তলিক সমাজে নিক্ষেপ করিতে,—পৌরাণিক সমাজের অন্তর্গত

হইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; তিনি সদ্বৃত্তি চরিতার্থের জন্য সদ্বৃত্তির আদর্শের পূজার আবশ্যকতা তাহা সরপট স্বীকার করে গেছেন।

স। তবে তিনি কি আমাদের সেই শিব না কি? তা না হলে এমন উপযুক্ত নির্ব্বাণ তন্ত্র রচনা কর্‌লেন্ কেমন করে? এই জন্যই শিবকে অমর বলে; বোধ হয় বিলাতের লোক বেশী শাক্ত বলেই শিব আমাদের দেশ ছেড়ে গিয়ে বিলাতের ফরাসিদের দেশে ছদ্মবেশে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ কোমত নাম ধরেছিলেন, এখন বুঝি আবার সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে, আমাদের কলিকাতার পটলডাঙ্গার ইউনিভারসিটি হলের (বটি) চোরা কুটুরীতে লুকিয়ে লুকিয়ে তন্ত্র শাস্ত্রের লেক্‌চার দিচ্ছেন, না কি? যা হোক, কোমত সাহেব দীর্ঘজীবী হউন, আমাদের রাজ্য আমরা তাঁহার কৃপাতেই ফিরে পাবার বেস যো হয়েছে, তা বেস্‌ই হয়েছে; ধর্ম্ম আছেন কি না? আমরাই হলুম দেব্‌তার জাত্, পুরুষগুলা হলো আমাদের নৈবিদ্য, তা নৈবিদ্যিতে আর পূজার ভাগ নিতে পারবে না। তা মায়া! শোন বন। আমি, প্রথম ছেলে বেলা, কন্যারূপা ছিলুম,—তখন আমি স্নেহরূপা দেবতা ছিলুম,—তার পরে বয়েসের জল মাথায় পড়্‌তেই আমার বিবাহ হওয়াতে আমি স্বামীর প্রেমরূপা সাক্ষাৎ দেবতাই ছিলুম,—এখন্ খোকা খুকীর মা হয়েছি,—এখন্ তো ভক্তিরূপ দেবতা হয়েছি, তার আর ভুলটী কি? তবে বন, তোরা দুজনে আজ আমাকে পূজা কর্ না!

মা। কি দে পূজা কর্‌বো? ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যি দে পূজা কর্‌ব না কি? আ মরন্ আর কি! ও হিসেবে আমিও কি এক খানি শরৎকালের প্রতিমা নই কি? তুমি কেন আমাকে পূজা কর না?

সঁ। তোমাকে, পূজা কর্‌তে হলে দীপান্বিৎ লক্ষ্মীপূজার অগ্রেই

তোমার পূজা হবে, নচেৎ ফাল্‌গুন মাসের সংক্রান্তীতে তোমার পূজা হবে।

দ। বেস্ ছড়া কাটাকাটি চল্‌ছে!

স। হ্যাঁ মায়া! তোমাকে একটী পাকা পরামর্শ বলি শুন, তুমি যখন কোথাও যাও, তখন হরি বাবু তোমাকে "কেন যাচ্ছ?" এমন কথা কি একটী বারও বলেন না!

মা। তাতে বেস্ টন্ টোনে! খুঁটিয়ে নাড়ী নক্ষত্রের খবরটী নেওয়া হয়। এই আজ আস্‌বার সময়ে "কেন যাবে? সেখানে আজ যাবার কারণ কি" জিজ্ঞাসা করে, তবে হাইকোর্টে গেলেন।

স। এবার যখন তোমাকে ঐ রূপ জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, তখন তুমি বল,—"নিয়মই এই, যার পা আছে, সে গিয়ে থাকে, যার পালক আছে, সে উড়ে যায়; যার পা আছে, তার যথা ইচ্ছা যথা দুচোখ যেতে চায়, সেই থানেই গিয়ে থাকে;—দুটী পায়ের নিয়মই এই, তোমরা নিয়ম দেখে থাক, কারণ জিজ্ঞাসার তোমাদের অধিকার কি?" এইটী বল দেখি?

মা। বেস্ বলেছিস বন! এইটী লাক কথার এক কথা! এই বার তাঁর বিজ্ঞান শীকেয় ওঠাব রসো! এই জন্য সময়ে সময়ে দুষ্টু সরস্বতী স্কন্ধে চাপ্‌বার দরকার করে।

স। তা বটেই তো? এই তো কলির উল্টো বিচার, না?

দ। তবে কি এখন তোমাদের তামাসার প্যালাই চল্‌বে না কি?

স। আমরা সত্যি সত্যি তো আর তোমার চৌবাড়ীর ন্যায় শাস্ত্রের পড়ো নই যে, "ধূলি কি ধূম!" এই কথার ছলধরে বেরাল লড়াই করে মিছু মুখে ফেকো উড়িয়ে মরব? এতক্ষণ যে কাঠখোলার চালভাজা খাওয়াল্লে? রসো, বুকে লেগে মরি যে! একটু গুড় খেয়ে গলাটাকে সরস করে নিই।—

দ। পচা কোত্‌রা খেতে কি ঘৃণা হয় না?

অস্তিত্ব প্রকরণ।

মায়া। আচ্ছা দয়া! তুমি বল দেখি ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? যে পদার্থকে দেখা যায় না, তাঁকে কি প্রকারে বিশ্বাস করতে পারি?

দ। তুমি নিজে আছ তার প্রমাণ কি?

মা। আমি এই জল্‌জেন্ত ধড়ফড়ে নড়ে চড়ে বেড়াতেছি, তাই আমার থাক্‌বার প্রমাণ।

দ। তোমার এই কাটামোর কল এই শরীরটী কি তুমি? না আর পৃথক্ কিছু বস্তু আছে, যাহা তুমি?

মা। বস্! কেন থাক্‌বে না? আমার শরীর যেমন আছে, তেমনি আমার জ্ঞান আছে—ভাব আছে—ইচ্ছা আছে—মন আছে—বুদ্ধি আছে এবং প্রবৃত্তি সকলও আছে। (প্রবৃত্তি আর ইচ্ছা একই কথা)

দ। তোমার শরীর ভিন্ন তোমার জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, মন প্রভৃতি যে সব আছে বল্‌লে, তার প্রমাণ কি?

মা। ও মা! ও আবার কি এক্‌টা কথা? আমার শরীরটা কেবল এক্‌টা কাটামোর কল বৈত নয়। শরীরটা যে কোন রূপ কর্ম্ম করে, নড়ে চড়ে দেখে শুনে, হাসে খেলে, খায়দায়, দয়া ধর্ম্ম করে, পড়া শুনা করে, তা কেবল জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, মন প্রভৃতির হুকুমে। জ্ঞান, ইচ্ছা, মন প্রভৃতিরা ভিতর থেকে শরীরটাকে যা হুকুম করে শরীরটা তাদের হুকুমেই কাজ কর্ম্ম করে থাকে; তারা শরীরটাকে উঠ্‌তে বললে উঠে, বস্‌তে বল্‌লে বসে, মর্‌তে বল্‌লে মরে; জ্ঞান যে টাকে ভাল কর্ম্ম বলে দেয়, শরীর সেই কাজই কর্ম্মে।

দ। জ্ঞান, ইচ্ছা, মন প্রভৃতি যে সকল বস্তু তোমার শরীরের মধ্যে আছে বল্‌লে, ও গুলিন্ কি তোমার এই হাড়মাস রক্ত প্রভৃতির গঠন শরীরের সামিল বস্তু, অথবা আর কোন রূপ খুদো বস্তু?

মা। ভাল জ্বালা দেখি! আমাকে কি তুমি পাগল পেলে? জ্ঞান, ইচ্ছা, মন প্রভৃতি কি কখন শরীরের হাড় মাস রক্তের সঙ্গে মিশুতে পারে? শরীর হল কল, জ্ঞান, ইচ্ছা, মন প্রভৃতি হল এই শরীর গুলীকে চালাবার কর্ত্তা।

দ। জ্ঞান, ইচ্ছা, মন প্রভৃতি যা বল্‌লে, সে কি রূপ যুদো জিনিষ?

মা। যেমন পাখীর খাঁচা আর পাখী। যতক্ষণ পাখীর খাঁচাতে পাখী থাকে, ততক্ষণ খাঁচা থেকে নানারূপ সুমিষ্ট স্বর বার হয়, খাঁচা হেলে দোলে, নড়ে চড়ে; পাখী সেই খাঁচা থেকে উড়ে গেলে খাঁচা পড়ে অমনি গড়াগড়ি যায়; সেই রূপ যখন শরীর থেকে মন, ইচ্ছা, ভাব, জ্ঞান, প্রভৃতি পালিয়ে যায়, তখন শরীর আর নড়েও না চড়েও না, এই পৃথিবীতে পড়ে, পচে গলে ধস্‌কে গিয়ে পাঁচে পাঁচ মিশিয়ে যায়।

দ। খাঁচা, আর পাখী এতো দুই দেখ্‌তে পাওয়া যায়; জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, মন প্রভৃতিকে তো আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?

মা। তা দেখ্‌তে না পাওয়া গেলে, তাতে ক্ষতি কি? ওটা একটা কথার ছলেও কি বলা যায় না? এই যে মানুষের গায়ে যে সকল শক্তি আছে, তা কি কেউ দেখ্‌তে পায়? মেঘের ভিতরে এই যে বজ্রের শক্তি আছে, তা কি কেউ দেখ্‌তে পায়? না কখন কেউ দেখ্‌তে পারে? এই যে পাটের কলে, চিনির কলে শক্তি আছে, তাকি কেউ দেখ্‌তে পায়? কেবল কাটাকুটি, ঘোরাঘুরি, গড়া পেটার শব্দ শুনে, দেখে, তাদের মধ্যে শক্তি আছে, এইটী স্পষ্ট বুঝা যায়; এই যে, আগুনের দাহকতা শক্তি আছে এবং সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি আছে, তা কি কেহ দেখ্‌তে পায়?

দ। এইখানেই আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে শেষ করতে

পারি, কিন্তু তার চেয়ে তোমাকে ভাল স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেব বলেই এখানে চেপে গেলুম।

মা। পার্‌লে ছাড় কেন? মিছে বড়াই ভাল লাগে না!

দ। এখানে তোমাকে একটী কথা বলে রাখি;—তবে কোন জিনিষ চোখে না দেখ্‌তে পেলেও তার কার্য্য দেখে সে জিনিষের থাকা সম্ভব হতে পারে?

মা। বস্! তা পারেই তো। এই যে তারের খবর, এক লহ-মায় দেশের কুড়, রাজ্যের কুড় হতে যাচ্ছে, আস্‌ছে, তা কেবল তো বিদ্যুতের শক্তিতেই যাওয়া আসা কর্‌ছে; সেই বিদ্যুতের শক্তি কি কেউ দেখ্‌তে পায়, না কোন কালে কেউ দেখ্‌তে পারে? কেবল খবর আস্‌ছে, যাচ্ছে দেখেই, তার দিয়ে তাড়িত-শক্তি যাওয়া আসা করে, এই তো স্পষ্টই জানা যাচ্ছে, সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি আছে, তা কি কেউ দেখ্‌তে পায়? সেই শক্তি জলের গুড়ুনি প্রভৃতিকে আকাশের দিকে টেনে তুলে বলেই, সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি আছে জানা যায়।

দ। যদিও তোমার কথার জবাব এই খানেই শেষ হয়ে গেছে, তবু এখনও চাপা থাক, তোমাকে আরও কিছু পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করি;—তোমার শরীর ছাড়া ইচ্ছা, জ্ঞান, ভাব, মন, প্রভৃতি যে সকল বস্তু তোমার শরীরের মধ্যে আছে বল্‌লে, তাদের একটীকেও কি কখন দেখ্‌তে পাও, না কেউ কখন পেয়েছে, না পেতে পার্‌বে?

মা। ও সব্ কি চোখে দেখা যায়? জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, মন প্রভৃতিকে কেউ দেখ্‌তে পায়ও না, পাবার সম্ভাবনাও নাই।

দ। তবে মন, জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব প্রভৃতিকে সহস্র দেখা না যাইলেও কেমন করে তাদের থাকা তুমি জান্‌তে পার্‌লে?

মা। কেন তাদের কাজ দেখে।

দ। তবে চোখে না দেখ্‌তে পেলেও কেবল কাজ দেখেই মন, জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতির থাকা এটী স্পষ্ট জানা যায়, এবং বিশ্বাস করা যায় তো?

মা। তা তো যায়ই যায়। কেবল আমিই কেন? সেই কাল আর এই কাল ধরে, ছোট বড় মধ্যম সকল লোকই তো কাজ দেখেই মন, জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব প্রভৃতির থাক বিশ্বাস করে আস্‌ছেন এবং চিরকালই ঐরূপে কর্‌তে হবে।

দ। তবে তুমি এই যে বলেছিলে "যা চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তাকে কেমন করে বিশ্বাস করব?" তবে মন, জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব প্রভৃতিকে তো দেখ্‌তে পাও না, এবং কোন মানুষ পারেও না, এবং পেতে পারেও না, তবে ঐ সকলকে তুমি না দেখেও বিশ্বাস কর কেমন করে?

মা। এই যে বল্লুম, কেবল কাজ দেখে।

দ। এখানে তোমাকে আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বল দেখি, এই যে হাঁড়ী কল্‌সী, ডেও ঢাক্‌না, ঘর বাড়ী, কলের গাড়ী, তারের ডাক পর্য্যন্ত যত দ্রব্য পৃথিবীতে দেখ্‌তে পাও, এর একটী জিনিসও আপনা আপনি হতে পেরেছে কি না?

মা। কোন জিনিস কি কখন আপনি হতে পারে? তা কখনই হতে পারে না।

দ। তবে এই গাছপালা, মানুষ গোরু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মেঘ বিদ্যুৎ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, নদ নদী সমুদ্র, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতিকে এক জন নিয়ম করে না কর্‌লে কেমন করে আপনা আপনি হতে পারে? যখন একখানি সরা, একটী বাট্‌লো এক জন তৈয়ার না কর্‌লে আপনা আপনি হতে পারে না, তখন এই বিশ্বসংসার দেখে, এই বিশ্বসংসারের এক জন অনন্ত জ্ঞানময় স্রষ্টা আছেন, এটী কেন না বিশ্বাস হবে?

মা। তা—তা, তা ঠিক কথাই তো; তা তো সত্যিই বল্‌ছ, এক জন না কর্‌লে জগৎসংসার কেমন করেই বা হবে?

দ। ভাল, যখন মন, জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতিকে কোন কালে দেখ্‌তে না পেলেও ঐ সকলের কার্য্য দেখে ঐ সকল বস্তুর থাকার কথা স্পষ্টই বিশ্বাস হয়; এমন কি, একে একে দুই হয় এ সত্যও যেমন বিশ্বাস হয়, সেইরূপ কার্য্য দেখে মন, জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব প্রভৃতির থাকা সত্যগুলিও বিশ্বাস হয়, তখন ঈশ্বরকে সহস্র না দেখা গেলেও, কোন কালে সম্পূর্ণরূপে অনুভব কর্‌তে না পার্‌লেও এই জগৎসংসার রূপ কার্য্য দেখে, এই জগৎসংসারের একজন জ্ঞানময় অদৃশ্য পদার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আছেন, ইহাতে প্রকৃত বিশ্বাস করিতে কি তিলমাত্রও বাধা হইতে পারে? যেমন জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, মন প্রভৃতি দ্বারা এই সকল সংসারের ঘট ঘটী, বাড়ী ঘর, জাহাজ নৌকা, কলের গাড়ী, তারের ডাক, নদীর নীচে রাস্তা, পাহাড় ছেঁদা করে রাস্তা, গ্রহনক্ষত্রের গতিনিরূপণ, পুথী পাঁজী শাস্ত্র প্রভৃতি অদ্ভুত কাণ্ড সকল হতেছে, মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা যখন এই সকল কার্য্য হতে পার্‌ছে, তখন জ্ঞানময় ঈশ্বর হতে এই বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ হয়েছে, এটী বলাতে কি কোনরূপ তর্ক এখানে স্থান পাইতে পারে? যেমন শরীরের মধ্যস্থিত জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, মন প্রভৃতিকে দেখিতে না পাইয়াও, যেমন তাদের কার্য্য দেখেই, সে সকলের থাক্‌বার পক্ষে কোনরূপ সংশয়ই থাকতে পারে না, সেইরূপ এই জগৎসংসার মধ্যে জগৎস্রষ্টাকে সহস্র না দেখা গেলেও জগৎসংসাররূপ কার্য্য দেখেই যে একজন অদৃশ্য পদার্থ জ্ঞানময় জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর আছেন, তাহা নিঃসংশয়রূপে জান্‌তে পারা যায়। তুমি এই সামান্য যুক্তিটীও কি হরি বাবুকে বুঝিয়ে দিতে পার নাই?

মা। মুখে ছাই আমার বুদ্ধির! মুখে ছাই আমার বিশ্বাসের!!

এইতো এখন বেস্ বুঝ্‌তে পার্‌লুম। রঃ, কাল্ তাঁর সঙ্গে আমার বোঝা পড়া হবে!

সরস্বতী। বলি হেদে বন দয়া! আজ্ থেকে তোমাকে আমি "তর্কালঙ্কার" বলে ডাক্‌বো। এবার পর্য্যন্ত দুটি বিদ্যালঙ্কারের নামটা তুমিই বন্ বাজিয়ে তুল্‌বে। এবার থেকে সব্ আদ্য শ্রাদ্ধে তোমার যাতে এক এক খানা পত্র হয়, তার জন্যে সুলভ সমাচারে ছাবানো উচিত।

মা। তা পত্র পান্ তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আঁচলে যে একটী একটী নস্যির শামুক্ বাঁদ্‌তে হবে, অগ্রে তার অভ্যাসটা পাকানো উচিত; এই বেলা সে কাজটা সরস্বতীর উপর্ দে পাকিয়ে নিলেই ভাল হয়।

স। সিথ্‌নি দিতে হয় তো তোমার গায়েই দেবে; আমি হলুম্ বামনের মেয়ে, তোমরা হলে কায়েত্, তোমাদের সিক্‌নির বাতাস্‌টা পর্য্যন্ত আমার গায়ে লাগ্‌লে আমাকে এখনি গে গঙ্গাস্নান কর্‌তে হবে, গয়ায় পিণ্ডি দিতে লোক্ পাঠাতে হবে।

মা। মুখে ছাই তোমার শাস্ত্রের! আমাদের সিথ্‌নি, কি ভূত না প্রেত যে, তোমার গায়ে তার বাতাস লাগ্‌লে গয়ায় পিণ্ডি না দিলে আর্ তোমাকে ছাড়্‌বে না? তোমার পটপটির কঁ্যাতায় আগুন!

স্রষ্টা ও নির্ম্মাতা প্রকরণ।

দয়া। "নির্ম্মাতা" কাহাকে বলে? যাহারা বস্তুর সংযোগ বিয়োগ দ্বারা ঘর বাটী প্রস্তুত করে, অথবা পুতুল, কল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "নির্ম্মাতা" বলা যায়, কিন্তু যে সকল পদার্থের দ্বারা অথবা যে সকল ধাতু প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহার একটীকেও কি কেহ প্রস্তুত অথবা

নির্ম্মাণ করিতে পারেন ? ঐ সকল নির্ম্মাতারা যাহা পৃথিবীতে নাই, অথবা জগতে নাই, এমন কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারেন কি ? পদার্থের সংযোগ দ্বারা দ্রব্যাদি গঠনের নাম "নির্ম্মাণ।" নির্ম্মাণের নাম "সৃষ্টি" নহে ; সৃষ্টির নামও "নির্ম্মাণ" নহে, যাহা আদৌ কিছু মাত্র ছিল না, তাহার উৎপত্তির নাম "সৃষ্টি," একেবারে অভাব হইতে পদার্থ উৎপাদনের নাম সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি যিনি করিয়াছেন, তাঁহাকেই স্রষ্টা বলা যায় ; তাঁকে কেবল নির্ম্মাতা বলা যায় না। ঈশ্বর যেমন একেবারে অভাব হইতে জগতের স্রষ্টা, সেইরূপ জগতের উপাদান উৎপাদন করেছেন বলে তিনি জীব জন্তু, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের যে সকল অতলস্পর্শ গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গল নিয়ম, অথবা কৌশলপূর্ণ নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে "বিধাতা, নির্ম্মাতা, স্রষ্টা" এই তিনটী উপাধিই লোকে প্রদান করেন।

মায়া। আচ্ছা দয়া! অনেক বিলাতী পণ্ডিতদিগের এমন মত আছে যে, জগৎ সংসারের "স্রষ্টা" কেহই নাই, তবে "নির্ম্মাতা" থাকিবার সম্ভব। পরমাণু এবং জড়প্রকৃতি অনাদি অনন্ত ; কেবল মাত্র ঐ সকল জড়প্রকৃতি অথবা জড় পরমাণুর সংযোগ দ্বারাই সেই অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানাপন্ন নির্ম্মাতা কর্তৃক এই সকল কৌশলপূর্ণ জীব, অথবা জড়জগৎ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। (১)

দয়া। ঐ মত বিলাতীই বা হবে কেন ? শত শত বর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের দেশের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রকারগণও ঐরূপ মত উদ্ভাবন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই সকল ন্যায় দর্শন শাস্ত্রকারগণ যমন, "দেশ, কাল, সংখ্যা, আকাশ, আত্মা, ঈশ্বর এই ছয়টীকে, অনাদি অনন্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেইরূপ পরমাণুকেও

---

(১) জনষ্টুওয়ার্ড মিল্ প্রভৃতির মত।

অনাদি অনন্ত বলিয়া সপ্ত অনাদি অনন্ত স্বীকার করিতেন। তাঁহারা জগতের নিমিত্তকারণ ঈশ্বরকে বলিতেন, এবং পরমাণুকে উপাদান কারণ বলিতেন। ঈশ্বর, উপাদান কারণ অর্থাৎ পরমাণুর দ্বারা কৌশলময় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এরূপ স্বীকার করিতেন। তা হলে ঐ মতে আর নূতনত্ব কি আছে?

মা। তা না হয় নাই থাক্‌লো, তাতে ক্ষতি কি? তা এ মতটী সত্য হলে, কেবল মাত্র ঈশ্বরকে তো আর স্রষ্টা বলা যাইতে পারে না?

দ। ঐ মতের মধ্যে ভারি ভুল আছে; পরমাণু যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, তাহার ব্যাস পরিধি থাকা স্বীকার করিতেই হইবে, যাহার ব্যাস পরিধি আছে, সে পদার্থ দেশে, কালে থাক্‌বেই থাক্‌বে; যাহার পরিধি আছে, এবং দেশে কালে যাহার অবস্থিতি, তাহার উৎপত্তি, বিনাশ থাকা স্বীকার সঙ্গে সঙ্গে হইয়া পড়ে; তখন পরমাণুর অনাদিত্ব প্রমাণ হইতে পারে না। তখন পরমাণু সৃষ্ট পদার্থ, তাহা স্বীকার না করিবার পক্ষে কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অদ্বৈতবাদ প্রকরণ।

মা। আচ্ছা, তুমি এই যে পূর্ব্বে বলেছিলে, আত্মা আর শরীর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, সেটী কি ঠিক কথা?

দ। তাতো ঠিক্ কথাই।

মা। তবে কি তুমি শঙ্করাচার্য্যের চাহিয়া পণ্ডিত হলে না কি? সেই সব মুনিঋষিরাও একমত হয়ে, আত্মা আর জগৎসংসারে যত জিনিস আছে, গাছপালা, মানুষ গোরু, পশু পক্ষী, বেলফুল গ্রহ নক্ষত্র, পৃথিবী, মাটী, সোণা রূপা, জল স্থল সকলই ব্রহ্মময়, বলে গেছেন যে, তার কি বল দেখি?

স। রস্ বন দয়া! আমি উত্তরটা আগু দেব। আচ্ছা মায়া! ঐ টী যদি ঠিক কথাই হবে, তা হলে স্রষ্টাই বা কে? আর সৃষ্টবস্তুই বা কি? তা হলে সন্দেস আর ময়রা একই পদার্থ হত তো? তা হলে সন্দেস যেমন মিষ্টি লাগে, ময়রাকেও তো খেলে সেইরূপ মিষ্টি লাগ্‌তো? তা হলে, চর্‌কা, সূত, তূল, তাঁতী একই হতে পার্‌তো? তা হলে তাঁতীর গা থেকেই ঢাকাই জাম্‌দান কাপড় সকল তো বার হতে পার্‌তো? অন্ততঃ মোটা বরনগরের কস্তাপেড়ে সাড়ীও তো বার হতে পার্‌তো?

দ। কর কি? একটু তামাসা ছাড়; শুন মায়া! ঈশ্বরই যদ্যপি এই জগৎসংসার হইবেন, তা হলে এই জগৎসংসারটীই তো ঈশ্বর? তবে ঈশ্বর একটী পৃথক্ জিনিস কি?

মা। তা তো ঠিকই এই জগৎসংসারই তো ঈশ্বর; কেবল মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা এই সব পদার্থকে পৃথক্ দেখ্‌ছি। "সংসার" এই জ্ঞানটী ভ্রম মাত্র। যেমন অন্ধকার রাত্রে পথে এক-গাছি দড়ি পড়ে থাক্‌তে দেখ্‌লে, হঠাৎ তাকে সাপ বলে বোধ হয়; সেইরূপ আমাদের ভ্রমাচ্ছন্ন অথবা মায়াতে আচ্ছন্ন চোখ্‌গুলা, এই জগৎরূপী সর্ব্বময় ঈশ্বরকেই সংসার বলে দেখ্‌ছে। যেমন হঠাৎ দড়ীকে সাপ বলে ভ্রম হয়ে থাকে, কিন্তু ক্রমে সেই দড়ীর নিকটে যত যাবে, ততই যেমন সে ভ্রম চলে যায়, এবং দড়ীকে সাপ বোধ ঘুচে গে, সেই দড়ীকে দড়ী বোধ হতে থাকে,, সেইরূপ মানুষের যত ভ্রম দূর হয়—যত মায়া দূর হয়—যত জ্ঞাননেত্র পরিষ্কৃত হতে থাকে, ততই সংসারকেই ঈশ্বর বোধ হতে থাকে। যতক্ষণ অজ্ঞানতা অথবা অবিদ্যা মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ততক্ষণ "আমি তুমি, জগৎ, আমার তোমার, মরা বাঁচা, সুখ দুঃখ" এইরূপ সব খেয়াল 'বকুনি বক্‌তে' থাকে; কিন্তু তপস্যা দ্বারা মায়ামোহ (অবিদ্যা) কেটে গেলে, তখন মনুষ্য ব্রহ্মেতেই

লয় পায়, অর্থাৎ সে আর ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই দেখিতে পায় না।

দ। বেসি কথা কাটাকাটির দরকার নাই; আচ্ছা বল দেখি, হিন্দুধর্ম্মে প্রধান শাস্ত্র বেদে, উপনিষদে, ভাগবতে, মহাভারত প্রভৃতিতে সেই মুনি ঋষিরা ঈশ্বরকে কি পদার্থ বলে গেছেন?

মা। কেন? সব শাস্ত্রেই তাঁকে "অশব্দ, অস্পার্শ, অরূপ" বলে গেছেন।

দ। তা হলে এই জগৎসংসার তো স্বরূপ, জগতের রূপ, রস, গন্ধ সবই তো আছে; তিনি যদ্যপি জগৎ হন, তা হলে তাঁর রূপ থাকা, তাঁর শব্দ থাকা, তাঁর স্পর্শ থাকা, সবই তো আছে?

মা। তা তিনি কেন হবেন? লোকে ও সব মায়া এবং ভ্রম হতেই দেখে থাকেন।

দ। আচ্ছা, ঈশ্বর তো মায়ামোহ-বিবর্জ্জিত? তাঁকে জ্ঞানপদার্থ বলে ঐ সকল শাস্ত্রে লেখা আছে তো?

মা। সেই মুনিঋষিগণ ঈশ্বরকে "অপাপবিদ্ধং মায়ামোহ-বিবর্জ্জিতং" এইরূপ পদে পদে বলে গেছেন এবং শাস্ত্রেও ঐ রূপ আছে।

দ। তবে ঈশ্বর যদি জগতের সকল পদার্থই হলেন, তা হলে তুমি, আমি, আর সমস্ত মানুষ এবং জগতের সকল জীব জন্তু, সকল গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, নৌকা জাহাজ, কলের গাড়ী, গাধা ঘোঁড়া, দাল কড়াই, সন্দেস মেঠাই, কাপাড় চোপড়, চন্দ্র সূর্য্য, বৃষ্টি মেঘ বিদ্যুৎ, লাল সাদা রং প্রভৃতি সকল বস্তুই তো সেই এক মাত্র ঈশ্বর?

মা। ও রূপ মতে তাই তো ধর্‌তে হবে।

দ। তা হলে কার্য্য কারণ সকলই তো ঈশ্বর?

মা। তা তো ঠিকই, তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

দ। তা হলে ভ্রম, (অবিদ্যা), মায়া, অভিমান, অহঙ্কার, অজ্ঞানতা,

মিথ্যা, দ্বেষ, রাগ, খুন, ডাকাইতী, ব্যভিচার যত দুষ্কর্ম্ম বলে জগতে আছে, আর দয়া মায়া স্নেহ, পুণ্য জ্ঞান পবিত্রতা যত প্রকার সৎ কার্য্য জগতে আছে সবই তো তাঁর কার্য্য? এবং ঐ সকল দুষ্কর্ম্মও তো তিনি স্বয়ংই?

মা। তা ও মত ধরতে গেলে সবই তো তিনি ধরতে হবে।

দ। তবে এই যে পূর্ব্বে বলেছিলে, ঈশ্বর মায়াহীন, ভ্রমশূন্য ঐ সব কথাও তো তাঁদের শাস্ত্রে আছে?

মা। তা আছেই তো? কে জানে বন? ও কথাও নয়, কথার দরুণও নয়।

দ। শুন, যদি তুমি আমি আর সকল মানুষ জীবজন্তু ঈশ্বরই হন, তা হলে আমাদের যে সকল পাপ, আমাদের যে সব ভ্রম অজ্ঞানতা, অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন থাকা, সে সব তো সেই ঈশ্বরেতেই থাকা বলতে হবে? জগৎ সংসারই যখন তিনি, তখন জগতে যত বস্তু বা পদার্থ আছে, সবই তো তিনি; তা হলে অবিদ্যা, ভ্রম, অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতি যত প্রকার পাপ আছে সবই তো তাঁতে আছে বলতে হবে?

মা। তা বন, ঐ পাপ সকলে জীবই লিপ্ত থাকে, শাস্ত্রে এই তো বলে।

দ। যদি জগতের সকল পদার্থই তিনি হবেন, তা হলে তুমি আমি আর সকল মানুষ, সকল জীব, সকল জীবের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য, সকল জীবের সকল প্রকার ভাব, সকল প্রকার ইচ্ছা, ইহকাল পরকাল সবই তো তিনি হলেন? তা হলে জীবের আর পৃথকত্ব কোথায়? যে ভ্রম (মায়া) অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন থাকা বলছ, আমাতে তোমাতে অথবা সকল জীবে যে ভ্রম অবিদ্যা (মায়া) আছে, তা সেই ঈশ্বরেতেই আছে বলিতে হবে তো? ঈশ্বরকেই ভ্রম, মায়া (অবিদ্যা) আচ্ছন্ন বলিতে হইবে তো? যদি বল,—ভ্রম, মায়া (অবিদ্যা) অভিমান তোমার আমার প্রভৃতি জীবের আছে, তাঁর সে সব নাই,

তাঁকে সে সব স্পর্শও করিতে পারে না, তিনি নিষ্কলঙ্ক ভ্রম মায়া-বিবর্জ্জিত; তা হলে ভ্রম (মায়া) অবিদ্যাবিশিষ্ট জীব ভিন্ন পদার্থ, এবং ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থ হয়ে পড়েন।

মা। তা বন, ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

দ। আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি; ঈশ্বরকে "সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ" এই তো শাস্ত্রে বলেছেন? তিনি যদ্যপি জগৎসংসারের সকল পদার্থই হইলেন, তা হলে মায়া (অবিদ্যা) ভ্রম, অভিমান, পাপ ইত্যাদি সকল পদার্থগুলি কি জগৎ ছাড়া ভিন্ন বস্তু? ভিন্ন পদার্থ তো জগতে থাক্‌তে পারে না? তা হলে অহঙ্কার, মায়া-মোহ ভ্রম (অবিদ্যা) যত প্রকার পদার্থ আছে, সকলই যখন তিনি, তখন আবার মুক্তির চেষ্টা করা কিসের জন্য? দুঃখ, শোক নিবারণ জন্য তপস্যার বা আবশ্যকতা কি? শোকনিবারণ হয়ে, শান্তি লাভের জন্য চেষ্টারই বা প্রয়োজন কি? লয় পাইবার জন্য তপস্যাতে আবশ্যক কি? তপস্যাই বা কার? আমিই যখন তিনি, তখন তপস্যাই আবার কার? মায়া মোহ (অবিদ্যা) ভ্রম, অভিমান, পাপ, শোচনা, দুঃখ যার মধ্যেই কেন থাকি না, ঐ সকল যখন তিনি স্বয়ংই, তখন ঐ সকলে আচ্ছন্ন থাকিলে, অথবা ঐ সকলের মধ্যে ডুবে থাকিলে তাঁতেই তো ডুবে থাকা হল, আবার পৃথক্ একটী "লয়" কিসের? তবে আবার ভ্রম, মায়া (অবিদ্যা) অভিমান, দুঃখ কাটাবার জন্য চেষ্টার বা প্রয়োজন কি? জলেতে জল মিশিয়ে থাক্‌লে তার আবার মুক্তি কি?

স। ওরে বন! ওরা সব ভূত! ওরা সব ভূত! ও সব না ছাড়ালে কি আর রক্ষা আছে?

দ। একটু থাম; শুন্ দয়া! মুক্তি পাওয়া কাকে বলে? আর ভিন্ন একটা বস্তুর হাত্ থেকে এড়ান্ পাওয়াকেই "মুক্তি বলা যায়।

যখন জগতে ঈশ্বর ভিন্ন কোন পদার্থ নাই বলিতেছ, তখন আর মুক্তি কার হাত্‌থেকে হবে? মুক্ত হবে কে? মুক্ত করেই বা কে? বন্ধের বস্তুই বা কি? ওতে বদ্ধও যাহা, মুক্তিই তাই; ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব যখন নাই, তখন সে পদার্থের আগমন কোথা থেকে হবে?

মা। তা বন! এ মত কি রকম?

দ। তার পর শুন, তাঁরা ঈশ্বরকে "সত্যস্বরূপ" বলে গেছেন, ঐটী বলাতেই জগৎ অসৎ সেটী বলা হয়েছে, "তিনি নিষ্কলঙ্ক" তবে ভ্রম, মায়া (অবিদ্যা) মোহ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি জগতে বিভিন্ন বস্তু আছে স্বীকার করা হয়েছে;—"তিনি পবিত্রস্বরূপ" তখন জগতে পাপের একটী পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, যেমন লোকে বলে "এইটী ভাল মেয়ে" একটী মন্দ না থাক্‌লে আব "ভাল" টী বলাই হতে পারে না। ভাল মন্দ, পবিত্র অপবিত্র, আলোক অন্ধকার, ছোট বড়, অল্প অসীম, এই দুটী দুটী ভাব এবং পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব থাকাতেই ঈশ্বরকে উচ্চভাবেই লোক সম্বোধন করে থাকে, এবং তাহাই তিনি; তুমি যদ্যপি অহঙ্কার অভিমান, মায়া মোহ, (অবিদ্যা) ভ্রম প্রভৃতিকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বস্তু বলে স্বীকার কর, তা হলে জগৎসংসার আর ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হয়ে পড়্‌বেন, তা হলে আর "জগৎসংসারই ঈশ্বর" এমতটীর অস্তিত্ব থাক্‌বে না। জগৎসংসার যদ্যপি স্বয়ং তিনিই হয়েন, তা হলে আমি যখন ভ্রান্ত,—তা হলে তিনিও ভ্রান্ত, তা হলে তিনি আর "অভ্রান্ত" এটী বলা হতে পারে না, কারণ তুমি আমি যখন তিনি ছাড়া ভিন্ন পদার্থ নহি, তখন আমাদের ভ্রান্তিতেই তাঁর ভ্রান্তি থাকা।—আমাদের মোহ, অবিদ্যা অহঙ্কার থাকাতে, তাঁরই ঐ সব থাকা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ আমাদের একটী পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। তা হলে, তিনি পবিত্র স্বরূপ, নিষ্কলঙ্ক অভ্রান্ত, মায়ামোহবিবর্জ্জিত বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারেন না যে, তার কি বল?

মা। তা ঠিকই বল! তা এমতটা কি শঙ্করাচার্য্য অত বড় লোক হয়ে বুঝ্‌তে পারেন নাই?

দ। এর ভিতরে একটী চমৎকার ভাব আছে; তিনি যে অত্যন্ত চিন্তাশীল লোক ছিলেন, তার একটী প্রধান উপমা স্থল এইটাই। "ঈশ্বর সর্ব্ব ঘটে" "ঈশ্বর জগদ্ব্যাপ্ত" এই চিন্তা নিগূঢ় রূপে করতে গিয়ে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যে ডুবে পড়ে, আপনাকে এবং জগৎকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর চক্ষেরও তো অস্তিত্ব ছিল না; তিনি ভাব-সাগরে ডুবে গিয়ে জগৎকে দেখ্‌তে পান নাই, এইটী বেস্ অনুভব হয়, যেমন মহর্ষি পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য দেব ভাব-সাগরে ডুবে গিয়ে মাঝে মাঝে বঙ্কবিহারী কৃষ্ণময় জগৎকে দেখ্‌তেন, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যেরও বোধ হয়, ঐরূপ জীবনের অবস্থা ঘটনা হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। মানুষ ভাব-সাগরে ডুবিবার সময় যিনি যে ভাব সঙ্গে করে ডুব দেন, তিনি যত নিমগ্ন হতে থাকেন, ততই সেই ভাব দেখ্‌তে পান, এই জন্য প্রেমিক ভক্তদিগকে লোকে "অন্ধ, গোঁড়া" বলে অল্পবুদ্ধি লোকে গালাগালি দে থাকে। তখনকার লোকে, ঋষিদের কথাতে—বড় লোকদের কথাতে হাঁ হুঁ করতে পারতেন না; তাঁদের নিকটেও আস্‌বার কালে দূর থেকে পায়ে গড়াইয়া পড়িতেন, এমন স্থলে তাঁদের সম্মুখে বসে সমানস্পাদ্য হয়ে তর্ক করা কি খেলা মামার ঘরকন্না?

মা। এই জন্যই চার্ব্বাকগণ মাঝে মাঝে খেপে উঠ্‌তো না? যাঁদের বুদ্ধি আছে, তাঁদের মুখে থাবাড়ী দে রাখ্‌তে গিয়েই লোকে, মতামতের গণ্ডগোল করে সারা হয়।

দ। ঐ মতের মধ্যে আরও একটী ভুল আছে। "ঈশ্বরেতে লয় হয়ে যাওয়াই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য" এই মতটীও ভারি ভুল কথা।

মা। কেন ভুল কথা হবে?

দ। আমাদের ইচ্ছা, মিষ্টি খেতে চাহে, না মিষ্টি হতে চাহে?

মিষ্টি খেতেই মানুষের প্রকৃতি; মিষ্টি হতে মানুষের প্রকৃতি চাহে না; জলপান করে পিপাসা দূর করাই আমাদের ইচ্ছা হয়, কিন্তু জল হয়ে যেতে আমাদের ইচ্ছা হয় না; সুখী হতেই আমাদের ইচ্ছা হয়ে থাকে, কিন্তু সুখ পদার্থটী হইতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, গুড় চিনী সন্দেস খেতেই মানুষের প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু গুড় চিনী সন্দেস হতে মানুষের প্রবৃত্তি দেখা যায় না; যদ্যপি আমরা গুড়েতে চিনীতে সন্দেসেতে মিশিয়ে গিয়ে গুড়, চিনী, সন্দেস হয়ে যাই, তা হলে আমাদের গুড় চিনী সন্দেস হওয়াও যা, আর নিম পল্‌তা কুইনাইন হওয়াও সমান কথা; যদি আমরা জলে মিশিয়ে জল হয়ে যাই, সে জল হওয়াও যাহা, আর অগ্নি হওয়াও তাই, যদ্যপি আমরা আলোতে মিশিয়ে আলো হয়ে যাই, তাতে আমাদের আলো হওয়াও যা, আর অন্ধকার হওয়াও তাই; কারণ আমাদের অনুভব শক্তি যখন থাক্‌বে না, তখন আমাদের সুখশান্তি বোধই থাক্‌বে না,—আলো অন্ধকার বোধই থাকে না, এটী কি, আমাদের মানুষের আত্মার মধ্যে এরূপ ইচ্ছার ভাব কি এক বিন্দুও খুঁজে বার্ কর্‌তে পারা যায়? আমরা সুখশান্তি পাব বলেই,—সুখশান্তি অনুভব কর্‌তে পার্‌ব বলেই, দয়াময় ঈশ্বর মানবাত্মাকে অমর করে সৃষ্টি করেছেন, তা যদি না হত, তা হলে মানবাত্মার অমর ভাবটী অপ্রতিহত থাক্‌ত না; কারণ তিনি যাহা, আমরা চেষ্টা করে যদি তাই হতে পার্‌ব, তা হলে আর জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল কি? সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যা ছিলেন, তাই থাক্‌লেই তো হতো? তাঁকে অনন্তকাল অনুভব করে সুখী হব বলেই মানবাত্মাকে ঈশ্বর অমর করে সৃষ্টি করেছেন, তখন মানবাত্মা চেষ্টা করে তাঁতে লয় হয়ে যাইতে পারে, এমতটী ভুল বলে বলা যাবে না, তো কি বল্‌ব? পুণ্য কর্ম্ম সৎকার্য্য করে জ্ঞান ধর্ম্মে পবিত্র হয়ে ইহকাল পরকালে ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়ে ক্রমশঃই তাঁর সহবাস-জনিত আনন্দ

অনুভব করে সুখশান্তি লাভ করতে থাকবে, কিন্তু কস্মিন্‌কালে কোন লোকে তাঁতে লয় হতে পারিবে না, এইটী পাকা মত বলে বোধ হয়। আর শুন, লয় হওয়াও যা, মরাও তাই, বিনাশও তাই, যদি মানুষের তাঁতে লয় হতে পারবার অধিকার থাকৃত, তা হলে "মানবাত্মা অমর, অনন্তকালস্থায়ী" এটী কেমন করে হতে পার্‌তো?

মা। কেন? তাঁতে মিশুলেও অমর হয়ে থাকা হল তো?

দ। আচ্ছা, পারা আর গন্ধক মিশিয়ে হিঙ্গুল হয়ে থাকে, কিন্তু যখন আগুনের সঙ্গে জাল দে দুটী পদার্থকেই উড়িয়ে দেওয়া যায়, তখন কি আর সে হিঙ্গুল থাকে? তখন গন্ধকের পরমাণু গন্ধকে মিশিয়ে যায়, আর পারার পরমাণু পারাতে মিশিয়ে যায়, তখন যেমন তাব্‌ আর হিঙ্গুলত্ব থাকে না, সেই রূপ মানবাত্মার ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সকল যদি ঈশ্বরেতে মিশিয়ে যায়, তা হলে মানবাত্মার আর পৃথক্‌ আত্মাত্ব কোথায় থাক্‌বে? তা হলে মানবাত্মার ধ্বংসাবস্থাই তো প্রাপ্ত হয়ে গেল?

মা। তা বল, এটীও তো ভুল মত দেখ্‌চি, তা আসল কথা কি? আসল কথা এই ঈশ্বর এই জগৎ সংসারের স্রষ্টা; জগৎ সংসার সমুদয়ই তাঁর সৃষ্ট বস্তু। মানবাত্মা সকল অমর, অনন্ত উন্নতিশীল, এবং স্বাধীন, সেই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মের ভালমন্দ ফলভোগী মানুষের আত্মাই হয়ে থাকে। মানুষের আত্মাগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাস্বরূপ নিয়ম মত সৎকার্য্য সকল করে ক্রমশঃই উন্নতি হতে থাক্‌বে, কখনই ঈশ্বরেতে লয় পাবে না, যেমন "সমান্তরাল রেখা" যতই নিকটস্থ হউক না, একত্রে যোগ যেমন হতে পাবে না, যতই কেন পূরণ জন্য—মিলন জন্য চেষ্টা করা হউক না, কিন্তু ক্রমশঃই অগ্রসর এবং নিকটবর্ত্তী হতে থাকে, কিন্তু কোন মতেই এক সঙ্গে যোগ হয় না, সেই রূপ মানবাত্মা সকল ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করে,—সুখশান্তি ভোগ করে, ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হতে থাক্‌বে, সেই দয়াময়

পতিতপাবন প্রেমময় সত্যস্বরূপের আনন্দ-মাখা শ্রী সন্দর্শন করিয়া সকল ভোগ কামনা চরিতার্থ হইতে এবং করিতে পারিবে, কিন্তু অনন্তকালেও কখনই তাঁহার সহিত একত্রে মিলিত অথবা মিশিয়ে লয় হতে পার্‌বে না, এইটীই ঠিক মত, ইহাই মনুষ্য-বুদ্ধির—মনুষ্য জ্ঞানের চরম সীমা বলে বোধ হয়।

মায়া। এই মতটী কি শঙ্করাচার্য্যের? না বেদব্যাসের?

দ। কেবল তাঁদেরই কেন হবে? উপনিষদের সময়ে ঐ মতের আভাষ প্রকাশ হইয়াছিল "যথোর্ণাভি সৃজতে গৃহ্লতিশ্চ"।

উপনিষদে উল্লেখ আছে, ঐ মতটীকে গোড়া করে, বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী পণ্ডিতগণ, তাহার বিস্তারিত রূপে বেদান্ত প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন।

মা। তা এ মতটী তো বড় কমও নয়?

দ। তা কম, কি বেশী, ওতে যে ভুল আছে তা তো বলা হয়েছে। এখনও কি তোমার সংশয় গেল না? মাকসাকে "ঊর্ণ-নাভি" বলে; ঐ ঊর্ণনাভি বাহিরে বস্তু খাইয়া তাদের যে লাল জন্মায়, সেই লাল থেকেই জাল বানায়, ঐ সকল মাকসার লালকে "বিকার" বলে, মাকসার মুখবিকার হইতেই সূতাজাল প্রস্তুত হয়; তা হলে ঈশ্বরে মায়ারূপ বিকার থাকা স্বীকার করিতে হয়; তাঁতে মায়া অথবা ভ্রম থাকা স্বীকার করিলে, তাঁকে "নির্ব্বিকার," অথবা "অভ্রান্ত" বলা যাইতে পারে না। যদ্যপি লাল নাই, অথচ লাল-বিশিষ্ট জীব, চক্ষু নাই অথচ "চক্ষুষ্মান্", জ্যোতি নাই, অথচ জ্যোতির্ম্ময় বলা যেমন কল্পনা মাত্র,—ছেলে মানুষী মাত্র, সেই রূপ নির্ব্বিকার অভ্রান্ত সৎস্বরূপ অনন্তজ্ঞান্‌জ্যোতি ঈশ্বরে মায়া থাকা, অথবা "ঈশ্বরের মায়াতে জগৎরূপ ভ্রান্তি হয়" বলাও সেই রূপ ভ্রান্ত মত। যদ্যপি মাকসার লালের প্রধান উপাদান রসবিকার স্বীকার কর, এবং সেইরূপ মায়াও ঈশ্বর ছাড়া একটী জগদ্ব্যাপিনী

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত।

TATTWA NIRNAYA

PART II.

BY

DENONATH BENERJEA.

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY R. S. BHATTA, AT THE BIDHAN PRESS, 72, UPPER CIRCULAR ROAD.

1886

মূল্য ১৲ মাত্র।

উৎসর্গ।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতি মাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ
পিতৃচরণেভ্যো নমঃ।

পরম পূজনীয় স্বর্গধামবাসী আরাধ্য মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পিতা ঠাকুর মহাশয় এবং পরম পূজনীয়া স্বর্গধামবাসিনী আরাধ্যা ভৈরবী দেবী মাতা ঠাকুরাণী-দিগের শ্রীচরণে দ্বিতীয় ভাগ তত্ত্বনির্ণয় উৎসর্গ করিলাম ইতি।

১১ জুলাই ১৮৮৬।
গরলগাছা জেলা হুগলী
কটক।

সেবক
শ্রীদীননাথ বন্দোপাধ্যায়।

The *Academy*, a high class literary journal of England, contains the following review by Professor Max Muller, on the Tattwa-Nirnaya :—

"There is a curious literature growing up in India which attracts far too little attention in England. It has long been known that many of the popular books of the day which occupy society for a few years till they are superseded by others are eagerly read by natives who have received their education at English schools and colleges. But it is much less known that many of these books are not only read, but carefully criticised, by natives, and that almost every post brings us reviews or pamphlets, written in Indian *vernaculars*, and containing curious examinations of the latest theories advanced by English philosophers. We have just received the first part of a work called *Tattwa-nirnaya (i. e.,* Examinaton of the Truth) by Denonath Banerjea, published at Calcutta so long ago as 1879. It is written in Bengali, and treats of the following subjects :—(1) "Atoms and Animals" (a criticism of Prof. Tyndall's theory) ; (2) "Transformation of Animals and Vegetables" (a criticism of Darwin's theory) ; (3) "Primary Condition ;" (4) "Soul and Brain ;" (5) "Immortality of the Soul ;" (6) "Free will ;" (7) "Automatism ;" (8) "Nature and the Self-existent ;" (9) "Immutable Relation between Creator and Creation" (a criticism of J S. Mill) ; (10) "First Cause" (a criticism of Comte) ; (11) "Fxistence ;" (12) "Creator and Coustructor ;" (13) "Pantheism" (a criticism of the pantheistic doctrines of the day). Though the treatment of these great questions is slight, yet as a phase of thought it is interesting ; and the future historians of India will find it very difficult to write his chapter on the renaissance of Indian literature in the nineteenth century unless some of our public libraries make a great effort to collect such books as Denonath Banerjee's *Tattwa-nirnaya*, and preserve them for use, if not at present, at all events in the future.—*Academy*.

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

TABLE OF CONTENTS.

PART I.

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

TABLE OF CONTENTS.

PART II.

ভূমিকা।

তত্ত্বনির্ণয় প্রথম ভাগ সন ১৮৭৯ সালে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ হয় ও প্রচারিত হয়; দ্বিতীয় ভাগের প্রথম ফরমা ছাপা হইয়া প্রেসে পড়িয়া থাকে; আমি প্রথম ভাগ ছাপা হইতে হইতে শঙ্কটাপন্ন রোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কটকে আসিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ তত্ত্বনির্ণয়ের অনেকাংশ লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একাংশ ম্যানাস্ক্রপ্ট বারানসীধামে পড়িয়া রহিয়াছে, অন্য কতকাংশ একজন আলাপীর জিম্মায় রাখিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম না; কতকাংশ প্রেসে ছিল, তাহার মধ্যেও কতকাংশ হারাইয়া গেল, এইরূপ বিড়ম্বনা সংঘটিত দেখিয়া পুনরায় তত্ত্বনির্ণয়ের অপরাপর ভাগ ছাপাইতে নিতান্ত অক্ষম হইলাম, বিশেষতঃ শরীর যেরূপ অসুস্থ তাহাতে চিন্তা করিতে কিম্বা লেখনী ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া আপনাকে বিশ্বাস করিতেছি, এমতাবস্থায় সকল দিগেই প্রতিকূল, কেবলমাত্র দয়াময় কৃপাসিন্ধু ঈশ্বরের কৃপাই অনুকূল দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার কৃপায় সকল অভাব থাকাতেও উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে যাঁহারা আমার নিতান্ত বন্ধু এবং প্রথম ভাগ তত্ত্ব-নির্ণয় যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে তত্ত্বনির্ণয়ের অপরাপর অংশ সমুদায় ছাপাইতে নিতান্ত অনুরোধ করিতেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমি কয়েক খানি সম্বাদ পত্রে, তত্ত্বনির্ণয় প্রথম ভাগ সমালোচন জন্য প্রদান করি, কিন্তু তাহার সমালোচন দেখিতে আমার স্পৃহা হয় নাই, কারণ আমার এইটী দৃঢ় বিশ্বাস

আছে এবং তখনও ছিল যে, তত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃত সমালোচনা এখন দেখিতে পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা। যখন ২।৪ শত বর্ষ পরে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পুস্তকের সমালোচনা, প্রাচীন দর্শনের সমালোচনা হইবে, তখন তত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃত সমালোচনা হইবে, সেই জন্য আমি কোন সম্বাদ পত্রের সমালোচন দৃষ্টি করি নাই। ইতিমধ্যে আমি এই কটক হইতেই কএকখানি প্রথম ভাগ তত্ত্বনির্ণয় ইংলণ্ডে মহামহোপাধ্যায় কোলাচল ভট্ট মোক্ষমূলার এবং বিখ্যাত প্রফেসর টিণ্ডেল, এবং শ্রীমতী সোফিয়া ডভটন, মিস কলেট, প্রভৃতিকে কএকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিই। তন্মধ্যে প্রথমেই শ্রীমতী মিস কলেটের সন ১৮—সালের ব্রাহ্ম ইয়ারবুকে তত্ত্বনির্ণয়ের একটু সমালোচন দেখিতে পাইলাম। অনেক দিন পরে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাপ্তাহিক লিটরেরি জর্ণেলে প্রফেসর ভট্ট মোক্ষমূলারের সমালোচনা প্রকাশিত হইল, এবং তাহা হইতে মান্দ্রাজের প্রগ্রেস তাহা উর্দ্ধৃত করিয়া প্রচার করিলেন, ক্রমশঃ লিবারেল এবং নিউ ডিস্পেন্সেশনে প্রকাশিত হইল। শুনিলাম ইংলণ্ডে বিখ্যাত এথেনিয়ম্ নামক লিটরেরি জর্ণেলেও সমালোচিত হইয়াছে, তখন মনে করিলাম আমার শ্রম এবং চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর নিকটেও একেবারে নিরর্থক বলিয়া গণ্য নহে, "তবে বিদেশে চণ্ডীর কৃপা, দেশে কেন নাই!" এই ভাবটুকু স্বভাবতঃই উপস্থিত হইল; এই সময় হইতেই দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ ছাপাইবার জন্য একটু ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু ম্যানাস্ক্রিপ্ট তো পাঠমালার সদৃশ নানাস্থানে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। তখন ইচ্ছা হইল, কিন্তু শক্তি কোথায় যে, অপরাপর ভাগ সম্পূর্ণ হইবে? ক্রমে দয়াময়ের কৃপাতে একটু একটু লিখিতে আরম্ভ করিলাম, পুরাতনগুলির যেরূপ উপাদান ছিল স্মৃতিপথে তাহার আবির্ভাব হইতে লাগিল এবং কএকটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিতে সক্ষম হইলাম। দুঃখের বিষয় যে, আমি কএক বর্ষ কাল অনেক পরিশ্রম

করিয়া যে সকল উদাহরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা ফুট্‌নোটে সন্নিবেশিত করিব স্থির ছিল, কিন্তু সে গুলি হারাইয়া যাওয়াতে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম। ভগবান্‌ উড়িস্যাতে আমাকে রাখিয়া নানা কার্য্যের ভার মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় সকল কার্য্য সমাধা করিয়া এই তত্ত্বনির্ণয় লিখিতে হইতেছে। শত শত কার্য্যভার বহন করিয়াও তত্ত্বনির্ণয় লেখা হইতেছে বলিয়াই এক সঙ্গে অপরাপর ভাগ মুদ্রাঙ্কণ করিতে পারিলাম না। এই জন্যই খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমার ইচ্ছা ছিল যে দর্শন শাস্ত্র সকল লোকের বোধগম্য হয়, এবং কথায় কথায় অভিধানের আবশ্যক না হয় এইরূপ লিখিব। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্র পাঠের অধিকারিণী হইতে পারিবেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত হয় এটীও আমরা ঐকান্তিক ইচ্ছা। স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত উপযোগী হইলে খুব সরল ভাষাতে লিখিবার চেষ্টা করা সাধ্যানুসারে উচিত,—সে পক্ষে আমি যেমন করিয়াছি, অন্য পক্ষে কঠিন শব্দ ভিন্ন দর্শন শাস্ত্র লেখা হইতে পারে না, এই যে একটী অপবাদ, সমস্ত সভ্য ভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছে, ভাষার সেই কলঙ্ক অপনোদন করিব এবং ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি দেশীয়, কি পাশ্চাত্য যত প্রকার মত এ পর্য্যন্ত সভ্যদেশ লইয়া ঘোর বিবাদ চলিতেছে, অতি সংক্ষেপে সকলের বোধগম্য এবং উদাহরণ মালা সাধারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে, এই ভাবে তত্ত্বনির্ণয়খানি লিখিত হইবে। সেই সকল উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছি তাহা আমার নিজ মুখে ব্যক্ত করিবার অধিকার নাই, এবং সেরূপ স্পর্দ্ধা করাও নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। সাধারণের নিকটেই তাহা বিবেচ্য। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার যতদূর সাধ্য ততদূর সরল ভাষাতে এবং যতদূর সাধ্য প্রস্তাব সকল মীমাংসা করিতে এবং কূটযুক্তি সকল খণ্ডন করিতে সমর্থ

হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভর করে দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত এবং প্রচারিত হইল।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তত্ত্বনির্ণয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

অনন্ত দয়া প্রকরণ।

মা। ও বন দয়া! আরও আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

দ। তা বল না?

মা। ঈশ্বর যদি দয়াময় হবেন, তাহলে মানুষের বাপ্ মা বেঁচে থাক্‌তে সন্তান অগ্রে মরে কেন? তিনিতো সর্ব্বজ্ঞ,—সব জানেন তো! যে সময়ে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন মানুষের আত্মার মধ্যে—সন্তানের প্রতি অতিশয় স্নেহ এবং ভালবাসার সৃষ্টি তো তিনিই করে দেছিলেন। তিনি এটীও তো তখন জান্‌তেন বাপ্ মার্ কোল ছাড়া করে সন্তানকে নিলে,—সে সব পিতামাতার কষ্টের সীমা থাক্‌বে না; পিতামাতার সম্মুখে সন্তান মরে গেলে তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট-দুঃখ পাবেন; যখন জেনে শুনে এই নিদারুণ কষ্টের, দুঃখের তিনি সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁকে দয়াময়, কেমন করে বলা যেতে পারে? যাঁর পূর্ণ দয়া আছে, তিনি কি কাহাকে খুঁনু প্রাণে কষ্ট দিতে পারেন? তাঁর ঐ সকল নিয়ম দেখে, তাঁকে দয়াময় কেমন করে বলা যাইতে পারে?

দ। তাঁর দয়া, মানুষের দয়ার ন্যায় নহে;—সে কথা পরে বল্‌ব,—এখন মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর দয়া কিরূপ সেইটীই বলি।—তোমার

প্রিয়নাথ ছেলেটী তোমার একমাত্র স্নেহের ধন,—অঞ্চলের নিধি,—তার প্রতি তোমার যত ভালবাসা, যত স্নেহ মমতা, অত কি পৃথিবীতে আর কেহ তাকে ভাল বাস্‌তে পারে, না তার প্রতি অত স্নেহ মমতা কাহারও আছে? না কারও থাকৃতে পারে?

মা। তাও কি কখন হতে পারে।

দ। তোমার প্রিয়নাথের ধাই বৌ শান্তির মা, আর তোমার প্রিয়নাথের স্যাংঙাত্ ব্রজ, জীবনকৃষ্ণ এবং তোমার বনঝী সরলা প্রভৃতি তোমার প্রিয়নাথকে কিরূপ ভালবাসে?

মা। ও বন! অমন ভালবাসা ভূভারতে দেখি নাই! বল্‌ব কি বন! ধাই বৌ শান্তির মা, আমার প্রিয়নাথের গায়ে একটী কাঁটার আঁচোড় লাগ্‌লে, একেবারে কেঁদে ভেসে যায়। অন্যকে অন্য এত ভালবাসিতে পারে তা স্বপ্নেও জানা যায় না! পেটের সন্তানকেও লোকে এত ভাল বাস্‌তে পারে কি না সন্দেহ-স্থল! সরলা তো প্রকৃতই সরলা;—সে প্রিয়নাথকে চক্ষে হারায়, এত ভালবাসে;—ব্রজ আর জীবন,—প্রিয়নাথ-অস্ত প্রাণ, তাদের দেখ্‌লে আহ্লাদে আট্‌খানা হয়,—একটু না দেখ্‌তে পেলে কেঁদে ভেসে একেবারে ঝোলা লেগে যায়!

দ। আচ্ছা বল দেখি, তাদের তো প্রিয়নাথের প্রতি এত ভালবাসা,—এত স্নেহ মমতা, কিন্তু তোমার প্রিয়র প্রতি তোমার যতটা নাড়ীর টান্, তুমি যত প্রিয়নাথের ভালমন্দের চিন্তা কর;—প্রিয়নাথকে কোথা রাখ্‌লে ভাল থাক্‌বে, কি রূপ রাখ্‌লে সে ভাল থাক্‌বে, তার বিষয় যত তুমি চিন্তা কর, তার শতাংশের একাংশও কি ধাই বৌ শান্তির মা,—অথবা সরলা, ব্রজ, জীবনকৃষ্ণ প্রভৃতি কেহ কি করে থাকে? না তোমার মতন তাহারা কেহ প্রিয়নাথের মঙ্গল, কামনা করে থাকে।

মা। তাও কি কেহ কখন পেরে থাকে?

দ। আচ্ছা,—যদ্যপি তুমি প্রিয়নাথের ভাল হবে মনে করে, কোন দেশের মুড়, রাজ্যের কুড় স্থানে আপনি সঙ্গে করে প্রিয়নাথকে নিয়ে যাও, যেখানে গেলে, ধাই বৌ শান্তির মা, সরলা, জীবনকৃষ্ণ, ব্রজ প্রভৃতির সহিত ইহ কাটামোয় প্রিয়নাথকে তারা আর দেখ্‌তে পাবে না, অথবা প্রিয়নাথের খপরটী পর্য্যন্ত পাবে না, এমন কি তাদের সহিত প্রিয়নাথের পুনরায় দেখা শুনা হবার সম্ভবও থাক্‌বে না, তা হলে তোমার ঐ সকল ব্যবহার দেখে, নিঃস্বার্থ স্নেহময়ী ধাই বৌ শান্তির মা, এবং ঐ ব্রজ, সরলা, জীবনকৃষ্ণ প্রভৃতি তোমাকে নির্দ্দয়া বলিতে পারে কি? তোমার প্রিয়নাথকে তারা নিঃস্বার্থ ভালবাসে, অকৃত্রিম স্নেহ মমতা করে বলে, তাদের সন্তোষের জন্য তুমি তোমার প্রিয়নাথের মন্দ কর্‌তে পার কি?

মা। ভাল পাপ দেখি! "মার চেয়ে ব্যথিত বড়, তাকে বলে ডাইন্" আমার ছেলের ভালমন্দের জন্য আমি হলুম দায়ী। তাদের দুদিনের ভালবাসার জন্য আমার প্রিয়নাথের আমি কি কখন মন্দ কর্‌তে পারি?

দ। আচ্ছা, তুমি ঐ রূপে প্রিয়নাথকে চিরকালের জন্য তাদের সঙ্গ ছাড়া কর্‌লে, তাদের সঙ্গে কি তোমার নিষ্ঠুরতা করা হয় না?

মা। কেন হবে? প্রিয়নাথের যাতে মঙ্গল হবে, আমার প্রাণ তাই কর্‌বে, যেখানে রাখ্‌লে তার মঙ্গল হবে, আমি তাকে সেখানেই রাখ্‌ব; প্রিয়নাথের মঙ্গল করাই আমার—মানব জীবনের প্রধান কাজ, তা যদি তারা না বুঝ্‌বে, তাতে আমার দায়—দোষ কি? তারা কি জানে না, আমারি প্রিয়নাথের সঙ্গে তাদের একদিন না একদিন ছাড়াছাড়ি হবেই-হবে; প্রিয়তো জগতের সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে তাদের সঙ্গে চিরকাল থাক্‌বার তো আর কথা নয়? তারা এসব জেনে শুনে বুঝে পড়ে অন্যায় দুঃখ শোক কর্‌লে, তার জন্য

আমার কসুর হবে কি? সে জন্য আমার নিষ্ঠুরতা হবে কেন? এক সময়ে নয় এক সময়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি হবেই হবে, এটী যদি তাঁরা না জানিত, এটী যদি তাদের জ্ঞাতসার না থাক্‌তো, তাহলেও একটু কথা ছিল, তারা জেনে শুনে হাবা কালার মতন,—আমাকে নির্দ্দয় বল্‌লে, তাতে আর আমার ক্ষতি কি?

দ। আচ্ছা, এই পৃথিবীতে বা জগৎসংসারে সকলের মাতা কাহাকে বলা যায় বল দেখি?

মা? কেন ঈশ্বরই সকলের মা, বাপ।

দ। ঈশ্বরই যদি সকলের মা বাপ, তাহলে তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাগণকে যেথানে খুসী, চাই ইহকালেই চাই পরকালেই যেথানে রাখুন, তাতে তাঁর নির্দ্দয়তা কেন হবে? তোমার ছেলের মঙ্গলের জন্য, তোমার যেথা খুসি সেইখানেই প্রিয়নাথকে নিয়ে যেত পার, ধাই বৌ শান্তির মা, সরলা, জীবন, ব্রজ প্রভৃতি তা দেখে তোমার দয়া মায়া নাই বলে, তোমাকে নির্দ্দয় বলা যেমন তাদের অন্যায় এবং বুঝ্‌বার দোষ, এবং সে কথাগুলি যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভ্রমপূর্ণ কথা, সেইরূপ যিনি জগতের পিতামাতা, তিনি তাঁর আপ-নার পুত্রকন্যাগণকে তাদেরই মঙ্গল জন্য যেথানে বা যে লোকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাতে তাঁর দয়ার স্নেহের কসুর হবে কেন?

মা। তিনি তো জান্‌তেন সন্তান হারা হলে পিতামাতার কষ্ট হবে, সেই কষ্ট নিবারণের উপায় করে দেন নাই কেন?

দ। দেন নাই তোমাকে কে বল্‌লে? এর পূর্ব্বেই তুমি আপনমুখেই ব্যক্ত করেছ যে, ধাই বৌ শান্তির মা, সরলা, ব্রজ, জীবনকৃষ্ণ প্রভৃতি, সকলেই জানে যে, এক সময়ে না এক সময়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি হবেই হবে, তারা জেনে শুনে বৃথা কষ্ট দুঃখ পেলে, তাতে তুমি তাদের কষ্ট দুঃখের জন্য দায়িক নও?

মা। তা তো হক্ কথাই ?

দ। আচ্ছা, তুমি এই পৃথিবীর ছোট বড় মধ্যম সকল লোককে জিজ্ঞাসা কর, যে সন্তান কন্যা পিতা মাতা স্বামী ভাই বন্ধু যত আত্মীয় সম্পর্কের আছেন,একদিন না একদিন পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইবেই হইবে, এ বিষয়টী কে না জানেন ? ঈশ্বর যদ্যপি সকল মানুষকে ঐ জ্ঞানটী না দিতেন, তাহলে বরং একটা কথা কহিবার পথ থাকিত ; যখন সকলেই জানে, এই জগতে কেহ অনন্ত ডালী মাথায় দিয়ে আসেন নাই, এবং কেহই এখানে চিরস্থায়ী হবে না, এই পৃথিবীটা পথের স্বরূপ, তখন এরূপ জেনে শুনে বুঝে পড়ে, এরূপ জ্ঞান টন্‌টোনে থাক্‌তেও আবদারে কোচি ছেলে মেয়ের মতন কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে রক্ত গঙ্গা হলে, তাতে আর দয়াময় ঈশ্বরের দয়ার অপরাধ কি ? পাছে লোকের কষ্ট দুঃখ হয় বলেই মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান বিবেক প্রদান করেছেন, এই দেখে কোথায় ঈশ্বরের অসীম দয়া এবং করুণার জন্য তাঁকে শত মুখে ধন্যবাদ দিতে হয়, না কোথায় তার উল্টা কথা ?

মা। তা সত্যিই বন ! বেদের বাজী ফক্কিকার ! এ জ্ঞানটী ঈশ্বর সকল মানুষকেই দেছেন।

দ। আরও শুন ;—তোমার সাতদেশে সাতটা বাড়ী আছে, তোমার যেখানে খুসী সেই বাড়ীতে সেই দেশে যদি তোমার প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়ে যাও, তা দেখে ধাইবৌ শান্তির মা প্রভৃতি মাথাখুড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে যদি তোমাকে নির্দ্দয়া, নিষ্ঠুরা ব'লে গাল পাড়তে থাকে , তা হলে তুমি কি মনে কর ?

মা। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি হয়েছে মনে করি, পাগল হয়েছে মনে করি ? কিন্তু বন ! ধাই বৌতে আর আসল মাতাতে জমিন্ আস্‌মান্ তফাৎ তা জান ?

দ। এই পৃথিবীর মাতাতে আর ধাই বৌতে বেশি তফাৎ কি?

দয়াময় ঈশ্বর হতেছেন সকল জীবের আসল মাতা, আর পৃথিবীর মাতৃগণ কেবল ধাই বৌ স্বরূপ, তখন আসল জগন্মাতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকন্যাগণকে সুখে সচ্ছন্দে রাখবার জন্য যে স্থানে রাখেন, তাতে ধাই বৌ স্বরূপ পৃথিবীর মাতাদের মাথা খুঁড়ে কষ্ট ডেকে আনাকে, ভ্রম এবং আব্‌দার ভিন্ন আর কি বলা যাবে?

মা। তা ভুল বটে; এই পৃথিবী মায়ার সাগর! কেহ কাহারও নয়, সব ফুস্ ফুস্ সব ফাঁকী! তবে একটী কথা আছে, পৃথিবীর মাতাতে, আর ধাই বৌতে অনেক তফাৎ আছে।

দ। বেসি ভিন্ন নাই; মাতার নাম "ধাত্রী" বলে একটী শব্দ আছে, তা জান? ঐ "ধাত্রী" শব্দের ইতর কথাতে "ধাই" অথবা "দাই" হয়েছে। যেমন "মেনকা" শব্দ থেকে "মেন্‌কা"—"দুর্গা" শব্দ থেকে "দুগী" বলে লোকে ডেকে থাকে, তেমনি "ধাত্রী" শব্দ থেকে, "ধাই" অথবা "দাই" শব্দ হয়েছে। আঁতুড়ে ছেলেকে হাতে করে ধরে বলিয়া ধাত্রী অথবা ধাই,—কিম্বা দাই নাম যেমন হয়েছে, সেইরূপ ছেলে মেয়েকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া মাতার নামও "ধাত্রী" বলে থাকে। আসল কথা উদরে ধারণ করেন বলে মাতাকে ধাত্রী বলে, আর প্রসব কালে যে হাতে ধরে সেও "ধাত্রী" আসল মাতা, কেবল একমাত্র সেই দয়াময় ঈশ্বরই; তাঁ হতেই সন্তান কন্যা উৎপন্ন হয়; তিনিই ধাত্রীদের স্তনে অগ্রে দুগ্ধ সঞ্চার করেন, তিনিই ধাত্রীদের হৃদয়ে স্নেহ এবং ভালবাসা প্রদান করেন, তিনিই মানুষ জন্মের পূর্ব্বেই যাহার যা আবশ্যক, তাহার জন্য সেই দ্রব্য সকল জগতে পূর্ণ করে রেখেছেন, তাঁরই দয়া, করুণা, স্নেহ, ভাল্ বাসা, জগতে পূর্ণ রয়েছে; তাঁর যেখানে খুসি,—তাঁর ছেলে মেয়েকে রাখ্‌বেন,—নিয়ে যাবেন, তাতে এই পৃথিবীর আব্দারে ধাই মাতা সকল জেনে শুনে জ্ঞান বিবেকের মাথায় পা দিয়ে কেঁদে, কেটে বৃথা হাইহুতোষ করলে, তাতে জগন্মাতার দয়ার ত্রুটির

খুঁত্ বাহির হবে কি সে? দয়াময় ঈশ্বর সর্ব্বদাই সকল মানুষের জ্ঞানেতে আবির্ভাব এবং বিবেকে আবির্ভাব হইয়া বল্‌ছেন "খপরদার আমার সম্পত্তিকে কেহ নিজের সম্পত্তি বলে অপহরণ কর্‌তে প্রবৃত্ত হইও না।" তাঁর সেই বাক্য কোন্ মানুষের জ্ঞানগোচর না হচ্ছে বল-দেখি? আচ্ছা যদ্যপি আমি একটী আমার সকের ভাল জিনিষ তোমার কাছে কিছু দিনের জন্য গচ্ছিত রাখি, এবং তোমাকে ইচ্ছামত ব্যবহার কর্‌তেও বলে দিই, তার পরে, সে জিনিষটীকে তোমার কাছ থেকে আমার যখন ইচ্ছা তখন ফিরে নিতে কি পারি না? সেটী যখন খুষি তখনই আমার কি ফিরে নিবার অধিকার নাই?

মা। তা তো আছেই আছে।

দ। আচ্ছা, আমি সে জিনিষটী ফিরে নিতে আস্‌বার সময়ে যদি তুমি কান্নাহাটি যুড়ে দাও;—সে জিনিষটীতে তোমার মায়া ব'সে যায় ব'লে আমাকে ফিরে দিতে তোমার কষ্ট দুঃখ হয় এবং প্রাণ ফাট্‌য়ে কান্নাযুড়ে দাও,—ফিরিয়া দিতে তোমার প্রাণ ফেটে যেতে থাকে, তাহা হইলেও আমি যদি তোমার সেই অন্যায় আবদারে কান্নাতে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে, (আমার অপর রূপ ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন থাকাতে,) সেই জিনিষটী তোমার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাই, তা হলে আমি কি তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা কর্‌লুম, এরূপ তুমি মনে কর্‌তে পার?

মা। তা আর কোন্ লজ্জার মাথাখেয়ে বল্‌ব?

দ। তা হলে দয়াময় ঈশ্বর পৃথিবীর মাতাপিতার হস্তে কতক গুলিন আত্মাকে কিছু দিনের জন্য যাহা গচ্ছিত স্বরূপ রাখেন, তাঁর যখন খুসি তখন যদি সেই সব আত্মাকে নিয়ে যান, তাতে তাঁর দয়া এবং করুণার ত্রুটি হবে কেন?

মা। তা, বন। এখন বেস বুঝতে পারলুম। দয়াময়ের

ত্রুটি গুরুপে বলা আবদার ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে কথা সত্যই।

দ। আচ্ছা. বল দেখি, আমার জিনিষ আমি তোমার কাছে, রাখি না রাখি সে অধিকার আমার, যত দিন রাখি, তত দিন তুমি তাহা ব্যবহার করে, যে সুখটুকু ভোগ কর, তার জন্য কোথায় কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, না উল্টেই আবার আমার কসুর—দোষ বলাটাই কি ঠিক্ পথ? ঈশ্বরের বস্তু, ঈশ্বর দয়া করে যত দিন ভোগ কর্তে আমাদের দেন, এবং আমাদের মঙ্গল জন্য এবং জগতের মঙ্গল জন্য তিনি সেই আত্মা সকলকে যেখানে খুসি সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলে, তাহাতে তাঁর দয়ার প্রধান পরিচয়ই পাওয়া যায়।

সরস্বতী। বলি, ও দয়া! তোমার কথা শুনে আমার পেটের ভিতরে হাত পা সেঁদিয়েছে! ও বন! তোমার কথার পায়ে দণ্ড-পত্ বন! আমি মনে করেছিলুম, অমলাকে তোমাদের কাছে রেখে, ভাল করে তাকে পড়া শুনা করার, তা বন! এই আড়ে দিকে মেপে নাকে কাণে খত দিই, ও ঝক্‌মারি আর কর্‌ব না! এখন বেস বুঝলুম "এই বনে এই বাঘ!" সাতজন্ম আমার মেয়েকে মুখ্‌খু সুখ্‌খু করে রাখব, তবু তোমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতেও দিব না। লেখা পড়া আমার মাথায় থাক্! এর পরে লেখা পড়া শিখে তৈয়ের হয়ে উঠলে, আমি যখন. তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ব, তখন আমার এত সাধের অমলা আমাকে দেখে বল্‌বে—"এসো এসো—ধাই বৌ এসো" আবার আমার বড় কপাল যোর্ হয়তো একটী পিঁড়ে সাজিয়ে, আমার সাম্‌নে ধরে দিয়ে বল্‌বে— "বলি, ধাই বৌ! পারিস্ তো আর এক দিন আসিস্?" হাঁ পৃথিবী! তুমি দু ফাঁক হও! নয় মাস দশ দিন পেটে ধরে গু মুত কেটে মানুষ করে শেষে আমাকে "ধাই বৌ" হতে হবে, এমন লেখা পড়ার মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দিই না? যা হোক্ বেনে!

বলি, দয়া! তোমার পাকাপণা কথা শুনে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে উঠেছে! মা, হলেন ধাই বৌ!! ঘোর কলি কি না? তোমরা বন একটী একটী তো মেয়ে নও,—একটী একটী জেঠাই বুড়ী, রাঁধ্‌তে বাড়্‌তে ভিক্ষা দিতে হাতে ধরে কুড়ি!

মা। - সাক্ষাৎ সরস্বতী কি না! তাই পাকে কথায় কথায় কবিতা জমেগে হার তৈয়ার হয়ে যায়!

স। এখন খোসামোদ কর,—না হলে দুষ্ট হয়ে স্কন্ধে চাপবো?

মা। দুষ্ট হয়ে চেপেছিলে ব'লেই তো শিব বাবু ফের ফেলা পৈতাটাকে আবার কাঁদে তুল্লেন। আবার কেন তাঁর কাঁদে সু হয়ে চাপ না?

স। আমিই বুঝি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? মেয়ে জাতটাকেই যে লোকে "দুষ্টু সরস্বতী" বলে থাকে, তা ওদিকে খপর আছে?

মা। ও কথার কপালে ছাই! মেয়ে জাত না থাক্‌লে এই পৃথিবী যে রাক্ষসপুরী হয়ে থাক্‌তো তা জান? আমরা হলুম মায়ের জাত্।

দ। এখন একটু তামাসা ফষ্টি ছাড়, তার পরে শুন;—

মা। আমার জবাব তো দেছ, আর্ শুনব কি?

দ। মনে নাই এর পরে বল্‌ব বলে ছিলুম? ঈশ্বরের দয়া আর স্বার্থ, মায়া মোহ ভ্রমের সহিত মিশানো, দয়া নহে; তাঁর দয়া মঙ্গলেই পূর্ণ; যাহা মঙ্গল, তাহাই তাঁর দয়া। আচ্ছা, বল দেখি, এক জনের ছেলের গলায় ফোড়া হয়েছে; সে ছেলের মাতা এমনি স্নেহময়ী, যে ছেলের গায়ে একটী কাঁটার দাগ দেখলেও কেঁদে ফেলে, কিন্তু ঐ ফোড়াটি যখন হয়, তখন সে মাতা কি করে থাকে? এখানে সেই ছেলের গলায় ছুরি দিয়ে পূঁজ বার্ করা তাঁর উচিত, কিম্বা, ছেলের গায়ে পাছে দাগ হয়, সেই ভয়ে ফোড়াটী বাড়িয়ে রেখে ছেলেকে খুন্ করা কি উচিত?

মা। তখন ছেলের যাতে মঙ্গল হবে তাই করা উচিত।

দ। কেন, ছেলের গলায় ছুরি বেলকায় দেওয়া কি নির্দ্দয়তা বা নিষ্ঠুরতা নহে?

মা। তা কেন হবে? ও যে ছেলের মঙ্গলেরই জন্য হতেছে, ওতে আরও দয়ার কার্য্য বল্‌তে হবে।

দ। তবে, এও সেইরূপ জেন, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়; মানুষের মঙ্গল হয়, তাই তিনি করেন, ইহকালের পরকালের মঙ্গল করাই তাঁহার অনন্ত দয়ার প্রধান পরিচয়।

দ। আচ্ছা, আরও একটী বল দেখি; এক জনের মা সন্তানকে ভারি স্নেহমমতা কিছু বাড়াবাড়ী গোচের করে থাকেন; তাঁর ছেলের পীড়ার সময়ে ছেলের মুখে যখন কুইনাইন কিম্বা বিষের ঔষধ তুলে দেন, তখন তাঁর দয়ার কাজ বল্‌বে, না, নির্দ্দয়তার—নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে?

মা। তাতে তাঁর দয়া এবং স্নেহরই পরিচয় পাওয়া যায়; সন্তানের মুখে তুলে ঐ বিষ এবং ঔষধ দেওয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্যই তো?

দ। তবে, পৃথিবীতে যে সব বিপদ দুঃখ কষ্ট দেখ, ও সকলও ঠিক্ ওষধি স্বরূপ, মঙ্গলের জন্যই; ও সব মঙ্গলে পূর্ণ; তখন ঐ সকল্ মঙ্গল-কর ঘটনা উপস্থিত হলে, ঈশ্বরের দয়া এবং মঙ্গল বিষয়ের পরিচয় না ব'লে কোন্ হিসাবে নির্দ্দয়তার পরিচয় দিবেন?

[illegible] ও দিগিরে দুঃখ কষ্ট প্রভৃতির কিছুই তো অস্তিত্ব থাকে না।

দ। তা তো নাইই নাই; তবে পাপের জন্য অনুতাপ প্রভৃতি দুঃখ কষ্টের অন্য রূপ অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সে অনুতাপও মঙ্গলের জন্য, সেই অনুতাপ দ্বারা পাপের কলঙ্ক আত্মা হইতে বিদূরিত হয়। আরও শুন, আচ্ছা, তোমার বাটীর দশটী বা কুড়িটী ঘর আছে; যে সময়ে যে ঘরে ইচ্ছা, তোমার ছেলেকে নিয়ে রাখতে

পার, তাতে ধাই বৌ প্রভৃতি সেই ঘরের অনুসন্ধান না জানে ব'লে, তোমার উপরে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অপবাদ দিতে পারে কি ?

মা। দিলে, আমার বয়েটা গেল ! !

দ। একজনের ছেলের গলার ফোড়াতে অস্ত্র হতেছে, স্নেহময়ী মাতা সেই সন্তানকে কোলে ক'রে ব'সে আছেন, দূর থেকে অন্য অপরিচিত লোক সেইভাব দেখে কি মনে করেন ?

মা। দূর থেকে ছেলের কাত্‌রাণী এবং কান্নাকাটি দেখে, সেই লোক হয়তো মনে করে, ছেলেটাকে মেরে দাখিল খুন কর্‌ছে।—

দ। কাছে এসে দেখে কি মনে করেন ?

মা। কাছে এসে দেখে মনে করেন, মা তার মঙ্গলের জন্যই ফোড়া কাটাইয়া দিতেছেন, আর চুমো খাচ্ছেন, বাতাস করছেন; আঁচলে বাঁধা খাবার দেখাচ্ছেন।

দ। এতেও সেইরূপ জেন, পৃথিবীর লোকের অবস্থা যাঁহারা দূর থেকে দেখেন, তাঁহারা ঐরূপ নির্দ্দয়তা, অমঙ্গল নিষ্ঠুরতাতে পরিপূর্ণ দেখেন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত চিন্তাশীল এবং বিশ্বাসপূর্ণ-হৃদয় এবং ঐ সকল অবস্থার নিকটে গিয়ে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা ঐ সকল অবস্থা মঙ্গল এবং দয়াতে পূর্ণ স্পষ্ট দেখিতে পান (আমার জীবনে ঐ ঘটনাগুলি স্পষ্ট দেখায়ে দিতে পারি; যদি দেখ্‌তে জান এবং দেখবার পথ জান, তাহলে আমার জীবনেই এ বিষয়ের স্পষ্ট আঁকা ছবি দেখ্‌তে পাবে) বরং চক্ষুমেলে দেখ।

মা। আমি এখন যে তোমার জীবনের নিকট হতে অনেক দূরে পড়েছি, তা দেখ্‌ব কোথা থেকে ?

দ। আচ্ছা, মায়া! তোমার ছেলের পোশাক্ যদি বদ্‌লে দাও,—রোজ বদ্‌লে দাও, এবং ন্যাংটো রাখ, তাতে তোমার নির্দ্দয়তা কি হয় ? তা হলে বিশ্বমাতা তাঁর সন্তানদের শরীর বদ্‌লে যদি আত্মাকে স্থানান্তর করেন তা হলে তাঁর নির্দ্দয়তা হবে কেন ?

স। (দয়ার মুখখানি হাত দে ধরে নাড়্‌তে নাড়্‌তে)—বলি ও বন! টগর ফুল! ইচ্ছা করে তোমায় আমি করি কাণের দুল!

মা। তবে কি আমাদের দয়া টগ্‌রী নাকি?

স। দয়া, আমাদের মেয়ে জেতের চাঁদ,—মেয়ে জেতের ধ্রুব প্রহ্লাদ! না হবে কেন? আমরা হলুম সরস্বতীর জাত, আমরা হলুম লক্ষ্মীর জাত, যে দুটানে দুনিয়া চল্‌ছে, আমরা তাই হলুম;—আমরা সেই জাত হলুম। পরকাল সম্পর্কে আমরা বড় কেও নই! বড় কেল্লাঁও নই! আমরাই হলুম তন্ত্রের কাঁচাখেখো দেবতার জাত! এ দিকেও বড় কেও'ও নই, আমরা হলুম মহারাণী এম্প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া বিক্‌টোরিয়ার জাত!

মা। কেবল কাঁদ্ কেন! না খুদ্ খেয়েছি, না?

দ। তবে এখন ছড়াই চল্‌বে নাকি?

মা। না, না ঢের্ কথা আছে।

অনন্ত মঙ্গল প্রকরণ।

মা। ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হইবেন, তাঁর উদ্দেশ্য যদি সকলই মঙ্গল পূর্ণ হইবে, তা হলে এই পৃথিবীতে এত দুর্ভিক্ষ, এত মারীভয়, এত ঝড় (সাইকোলন্) প্রভৃতি হয়ে মানুষ প্রভৃতি ম'রে উড় কুড় উটে যায় কেন? পৃথিবীতে এত পাপাচার বৃদ্ধি হয় কেন? সাপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদ্বারা এতো লোক মরে কেন? রোগ শোক প্রভৃতিতে লোক জরজর হয় কেন? দুঃখ কষ্টে হাহাকার করে কেন? যে সকল নিয়ম মানুষের বুদ্ধির অতীত ক'রে সৃষ্টি করেছেন, সে সকল নিয়ম না বুঝ্‌তে পেরে মানুষ যে সকল কার্য্য করে, তাতে মানুষের দুঃখ কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয় কেন? শরীর সকল জীর্ণ—শীর্ণ হয় কেন?

দয়া। আচ্ছা, সূর্য্যের তেজ আছে বলিয়াই আমাদের এই পৃথিবী এবং জীব জন্তু জড় সকলের অস্তিত্ব ; ঐ তেজ যদি পৃথিবীতে না আসিত, এবং পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে কিছু ঐ তেজ যদি এই পৃথিবীতে সঞ্চিত না থাকিত তাহা হইলে একটীও জীব জীবিত থাকিতে পারিত কি ? ঐ সূর্য্যের তেজ আছে বলিয়াই জীব এবং জড় জগৎ জীবিত বা কার্য্যক্ষম হইতেছে তাহা তুমি জানত ? ঐ তেজ যখন গ্রীষ্মকালে একটু বাড়াবাড়ী হইয়া থাকে কিম্বা সেই সূর্য্যের দুই প্রহর বেলার তেজ গায়ে লাগিয়া ঘাম বাহির হইতে থাকে, তখন সেই কষ্ট দেখিয়া সূর্য্যের সৃষ্টি কিম্বা তেজের সৃষ্টি অমঙ্গলদায়ক বলা যাইতে পারে কি না ? ঐ সূর্য্যের ভিতরের বিষয় সকল আমরা অধিকাংশই অনন্তকাল অজ্ঞাত থাকিলেও সূর্য্যের তেজ যে আমাদের এই জগতের জীবগণের জীবন ধারণের এবং কার্য্যক্ষমতার প্রধান উপাদান এবং সূর্য্যতেজের সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব জীবন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে এটী বলা যাইবে কি না ?

মায়া। তা ত বলিতেই হইবে।

দ। কেন ? সূর্য্যের তেজে যখন নদীর বালি গরম হইয়া উঠে কিম্বা মরুভূমি আগুনের ন্যায় উত্তাপ বর্ষণ করিতে থাকে, তখন পথিক লোকের মধ্যে কেহ পড়িয়া মারা যায়, এমত স্থানে সূর্য্যের সৃষ্টি অমঙ্গলদায়ক কেন না বলা যাইবে ?

মা। জেনে যারা অগুণে ঝাঁপ দিয়ে মারা যাবে, তার জন্য কি আগুণের দোষ হতে পারে ?

দ। কেন ? সূর্য্যের তেজের সকল ব্যাপার আমাদর জ্ঞানের বা বুদ্ধির বা চিন্তার গোচর করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তখন সেই সূর্য্য-কর্ত্তৃক যে কোন কষ্ট আমাদিগের হইবে সেই টুকুই নির্দ্দয়তার কারণ বলা যাইবে না কেন ?

মা। আমরা মা বাপের মনের অবস্থা সকল ত জানি না এবং সে

সকল আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত, মা অনেক সময় মেরে থাকেন, বকে থাকেন, তবুও তাঁদের সকল কার্য্যই মঙ্গলোদ্দেশ্যে হয় এটী যেমন স্থির বিশ্বাস আছে, সেইরূপ সূর্য্যের তেজ দ্বারা একটু আমাদের বিবেচনার দোষে—বুঝে না চলিবার দোষে—যে কষ্ট হয় তাহাতে পাগল ভিন্ন যার বুদ্ধি আছে সে কি কখন অমঙ্গল বলিতে পারে?

দ। পৃথিবীতে সঞ্চিত সূর্য্যের তেজই "আগুণ" তাহা তুমি জান ত? ভাল, ঐ আগুণের জন্যই আমরা মনুষ্যত্বের গৌরব পাইতেছি, এটী জান ত? কলের গাড়ী, কলের জাহাজ, তারের খবর হইতে লাগাইদ রাঁধাবাড়া পর্য্যন্ত অসুধ বিসুধ যত রকম আছে, সকল উপকার আমরা আগুণের দ্বারা পাই এটী জান ত? কিন্তু সেই আগুণেই মানুষের ছেলে পুড়ে মারা যায়, আমাদের হাত পা পুড়ে যায়, মানুষের ঘরে আগুণ লেগে ছার খার হয়ে যায়, এতে আগুণের সৃষ্টিতে মঙ্গলভাব কি আছে বল দেখি?

মা। আমি তোমায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি তুমি এই কথার জবাব দাও।

সরস্বতী। ওলো, উলটে কথা কোস্ কেন লো? আসামী কখন কি আর্জ্জি দাখিল করে লো?

দ। আচ্ছা তাই হোক ভাল, এই যে যেমন আগুণের মূলতত্ত্ব আমরা সকল জানি না, কিন্তু আমাদের অসাবধানতাপ্রযুক্ত জ্ঞান এবং বুদ্ধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া যে আগুণের দ্বারা আমাদের সময়ে সময়ে অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে তাতে কি আগুণের সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরে মঙ্গল উদ্দেশ্যের অভাব বলা যাইতে পারে?

মা। যার বুদ্ধি আছে সে কি আর এ কথা বলিতে পারে?

দ। বিদ্যুৎ বা তাড়িতশক্তি আছে বলেই জীবের এবং জগতের শরীরবন্ধনী সমভাবে রহিয়াছে, সেই তাড়িত শক্তির বিষয় মানুষ অনন্ত কালে সকল জানিতে পারিবে কি না সন্দেহস্থল; এত দিন

যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা অতি সামান্য মাত্র। হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই তাড়িত শক্তিকে কেবল "বাজপড়া" বলিত। তাড়িতের দ্বারা তারের খবর চলে, সকল প্রকার রোগ আরাম হয় তাড়িতের দ্বারা শরীর ধারণ করিতেছি। তাড়িতের দ্বারা এক মাসের পথ ৩০ ঘণ্টায় যাওয়া যায়, তাড়িতের দ্বারা পাকস্থলী প্রভৃতির পরীক্ষা হয়, তাড়িত দ্বারা সহরময় আলোক হয়, পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া থেকে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যাহারা পূর্ব্বে তাড়িতকে "বজ্রাঘাত" ভিন্ন আর কিছুই জানিত না তাহারা তাড়িতের সৃষ্টিকে ঘোর অমঙ্গলদায়ক ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারিত কি? এইটীতেই প্রমাণ হইতেছে যে মানুষ আলোচনায় নিরস্ত থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলেতে যে সকল দুর্ঘটনা ও অমঙ্গল দায়ক বলিয়া স্থির করে কালে সেই বিষয়ের মূল ভাব সৃষ্টি কৌশলের গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্য অঙ্কশাস্ত্রের মতন পরিষ্কার-রূপে প্রমাণ করিতে পারে এবং দেখিতে পায় তাহার জীবন্ত উদাহরণ এই তাড়িতের ব্যাপারকে কি বল যায় না?

মা। ওলো যারা হেরো নাই করে তাদের কি কেউ এঁটে উঠতে পারে।

দয়া। জলই জীবের জীবন, সেই জলেই মানুষের অবিবেচনায় নৌকা ডুবি হইয়া থাকে তাহাতে কি জলের সৃষ্টির মঙ্গল উদ্দেশ্যের দোষ বলিতে হইবে? বাতাস জগতে আছে বলেই জীব জন্তু বেঁচে আছে। (এইটী মোটা মুটী কথা) কিন্তু সেই বাতাস যখন বড় ঝড়ের আকার ধরে, বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়া দেয়, জীব জন্তুকে ওলট-পালট করে দেয়, বড় বড় বাড়ী ঘর দোর সব রসাতলে যায়, নৌকা ডুঙ্গি ডুবাইয়া দেয়, এতে কি বাতাসের সৃষ্টিকে আমরা অমঙ্গল দায়ক বলিতে পারি? না সময়ে সময়ে বড় বড় ঝড়ের সৃষ্টিকে অমঙ্গলদায়কে বলিতে পারি কি? যেমন সমুদ্রেতে নানা প্রকার

দূষিত জল, খাল নালা এবং নদীর দ্বারা গিয়া পড়ে পুনরায় সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির দারা বাষ্পরূপে উঠিয়া মেঘ হইয়া আবার বিশুদ্ধ জল হইয়া নানা স্থানে পড়িয়া সকল জীব জন্তুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও নানা রকম অভাব মোচন করিয়া থাকে, প্রবল ঝড়ই সেই মেঘকে চালনা করিবার প্রধান উপাদান। আরও পৃথিবীতে নানা স্থানে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে পচা দুর্গন্ধময় পদার্থ হইতে যে সব দূষিত বিষতুল্য বাষ্প সঞ্চিত থাকে, যাহা বেশী দিন সঞ্চিত থাকিলে মনুষ্যকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইত বড় বড় ঝড়ের দ্বারা সেই সকল প্রাণ নাশক বিষবৎ পদার্থ সকলকে উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তরে লইয়া ফেলিয়া দেয় এবং সেই সকল স্থানকে স্বাস্থ্যকর করিয়া দেয়, এখন বল দেখি বড় ঝড় হওয়ার মূল তত্ত্ব সকল অনন্তকাল অজ্ঞাত থাকিলেও যে টুকু জানা গিয়াছে সেই টুকুতেই অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্য বিদ্যমান দেখা যায় কি না?

দেখ জল, বায়ু, অগ্নি, তেজ, তাড়িত, প্রভৃতির যত প্রকার সৃষ্টির নিয়ম বলা হইল মানুষের আদিম অবস্থায় এই সকল বিষয় কেবল অমঙ্গল দায়ক ও ভয়ের বিষয় বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু যত এই সকল বিষয়ের অনুশীলন করা হইয়াছে, তত্ত্বানুসন্ধানী হইয়া যতই নিকটে যাওয়া হইয়াছে ততই মঙ্গল বিষয় মঙ্গলদায়ক ও সার্ব্বভৌমিক উপকার প্রমাণ হইয়া আসিতেছে এটিকি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? এখন যাহা লোকে কূট তর্কের দ্বারা অমঙ্গল বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যায় কালে তাহাই আবার তত্ত্বানুসন্ধায়িদিগের দ্বারা তাঁহার অনন্ত মঙ্গলোদ্দেশ্য প্রমাণিত হইবে।

মা। থাক্ বোন, ঢের হোয়েছে।

দ। শোন। তাড়াতাড়ি কর কেন? ভাল, এই যে পৃথিবী একেবারে প্রস্তুত হয় নাই তাহা তুমি জান। ভূতত্ত্ববিত্ পণ্ডিতদিগের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এক সময় এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ ভিন্ন আর কোন জীব ছিল না। তার পরে পৃথিবীর অপর স্তরে প্রমাণ করা হইয়াছে যে বড়

বড় ভালুকের মত হিংস্র জন্তু ছিল, এই পৃথিবী এক সময়ে তাহাদেরই বাসস্থান ছিল। কিন্তু অনেক স্তরের পরেতে পৃথিবী মানুষের বাসের উপযুক্ত হওযার পর মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের আদিম অবস্থাতে সাপ, ভালুক প্রভৃতিকে কেবল মাত্র অপকারী জীব ও হিংস্র জন্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু কালে প্রমাণীকৃত হইল যে সাপের বিষে ঔষধ তৈয়ার হইতে পারে মুমূর্ষব্যক্তি সেই ঔষধ দ্বারা জীবন পুনঃ প্রাপ্ত হয়। তখন যে বিশ্বাস পূর্ব্বেছিল যে সাপ কেবল অমঙ্গলদায়ক সৃষ্টি, সে বিশ্বাসের একটু লাঘব হইল এবং প্রশ্ন হইল যে, সাপেতে কিছু উপকার আছে; অনেক কাল পরে আলোচনা দ্বারা পুনরায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে সাপের যে নিঃশ্বাস তাহাও আমাদের প্রাণবায়ুর সহায়তাকারী। আর মানুষের নিশ্বাস দ্বারা যে সকল বিষবৎ পদার্থ বাহির হয়, যাহা গ্রামে কি বাটীতে সঞ্চিত থাকিলে মানুষের জীবন ধারণের অনেক ব্যাঘাত ঘটিত, সেই বিষবত্ পদার্থ সকল সাপেরা প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে। অতএব সাপ, মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনেক উপকারে আসে। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সে সাপের সৃষ্টি মঙ্গলদায়ক। যে সাপ কেবল অমঙ্গলদায়ক বলিয়া পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত ছিল তাহাই মানুষের মঙ্গলদায়ক। কালে ঐ সাপের সৃষ্টিতে আরও অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্য প্রকাশিত হওয়ার কি সংশয় আছে? এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদাহরণ সকল দেখে সাপ ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সৃষ্টির মধ্যে যে ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলভাব সে কথায় সংশয় হইবার কি কারণ আছে? কখনই না।

আমাদের চক্ষু বিকৃত হলে কাচের চসমা দ্বারা আমাদের কত উপকার হইয়া থাকে। সেই কাচেতে অণুবীক্ষণও দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইয়া জগতের বিজ্ঞান শাস্ত্রের কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছে, কাচের গেলাস, কাচের ফানস, কাচের দ্রব্যাদি দ্বারা মানুষের কত না উপকার হইতেছে? কাচের যন্ত্রের দ্বারা কত রকম রাসায়ণিক দ্রব্য প্রস্তুত

হইতেছে। কিন্তু সেই কাচের দ্বারা আবার অসাবধনতা বশতঃ ছেলেরা হাত কাটিয়া ফেলে। ভাঙ্গা কাচ গায়ে ফুটিয়া হয় ত মারাও যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে কাচের সৃষ্টির মধ্যে কোনরূপ মঙ্গল উদ্দেশ্যের অভাব বলা যাইতে পারে? কাহারও শিশুসন্তান অজ্ঞানতা-বশতঃ কাচে হাত কাটিয়া ফেলিয়া কষ্টপাইল দেখিয়া তাহার পিতা মাতা কাচের স্রষ্টার মঙ্গলোদ্দেশ্যে দোষারোপ করিতে কি পারে, না তাহাদেরই অসাবধানতার দোষ?

লোহা ও শীসেতে জগতের কত উপকার হইতেছে, তা ত দেখি-তেছ, কিন্তু সেই লোহাতে ও শীসেতে বন্দুক, তরবার, গুলি, বর্ষা, তোপ ইত্যাদি প্রস্তুত করে মানুষে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যভিচারী হইয়া জ্ঞান এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আদেশের বিরুদ্ধে যে পরস্পর নরকময় হত্যা-কাণ্ডেতে নিযুক্ত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব বিনষ্ট করিয়া আসিতে-ছেন তাহাতে কি লৌহ ও সীসা ইত্যাদির সৃষ্টি এবং মানুষের স্বাধীনতা প্রদানের অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্যের অভাব বলা যাইতে পারে?

দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, মাখম, নানারূপ ফল মূল খাদ্য ঈশ্বর আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অক্ষুধাতেও (যখন আমাদের প্রকৃতি সে সব বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না) সেরূপ বাধা সত্ত্বেও লোভে পড়ে মানুষ জ্ঞানের বিরুদ্ধে অপরিমিত খাইয়া নানা প্রকাশ উৎকট পীড়াকে ডেকে এনে থাকেন তার জন্য এই সকল অমৃ-তুল্য ফলমূলের সৃষ্টির ও জীবের খাইবার ইচ্ছার (বুভুক্ষা) সৃষ্টি অনন্ত মঙ্গলোদ্দেশ্যের কি অভাব বলিতে হইবে?

জল ও বাতাস উপযুক্ত মতে জেনে ব্যবহার না করিলে ঐ জল বায়ুর ব্যবহার জন্য নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে এটী কোন মানু-ষের জ্ঞানেতে প্রকাশিত নাই? তখন অসময়ে অন্যায় পূর্ব্বক জল ও বাতাস ব্যবহার করিয়া লোকে সর্দ্দি ও বাত প্রভৃতি রোগে যে পীড়িত

হয় তাহাতে কি জল বায়ুর সৃষ্টির মঙ্গল উদ্দেশ্যর অভাব বলিতে হইবে ?

যেখানে মেলেরিয়া ও সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হয় সে স্থানের জল বায়ুর অবস্থা নিতান্ত বিষতুল্য হইয়া থাকে, কোন মানুষের জ্ঞানেতে এটী প্রকাশিত না হয় ? মানুষ আদিম অবস্থায় যখন ঘোর অজ্ঞান ও মূর্খ ছিল তখন গ্রামে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিত এখনও সেই রীতি পাহাড়ে অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এমন ঘোর বিপদকে সম্মুখে দেখেও স্থান পরিত্যাগ করিবার আদেশ জ্ঞানের কাছথেকে বারম্বার পাইয়াও সংক্রামক রোগ অথবা ম্যালেরিয়া উপস্থিত হলেও লোকে পুঁইগাছ, কলাগাছ, বাগান বাড়ির সামান্য মায়ায় জড়িত হইয়া সেই-খানে পড়ে থেকে অকারণ মারা যেতে থাকে তাহাতে কি ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের ক্রুটি বলিতে হইবে ? ঘরে আগুণ লাগিলে ছেলে পিলেকে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে লোকে পলায় কেন ? যখন দেশে সংক্রামক রোগরূপ আগুণ জ্বলিয়া উঠে তখন সেই দেশকে পরিত্যাগ করিতে কি জ্ঞান আদেশ দেয় না ? এমন অবস্থায় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আমরা যে জ্ঞানের বিরুদ্ধে কার্য্য করে ডেকে এনে থাকিঁ, সে পক্ষে কি কিছু ভুল আছে না সংশয় আছে ?

স। ওলো দয়া ! তিনি যখন আমাদের কর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সৃষ্টি করেন নাই তখনি তাঁর ভুল হইয়াছে।

আচ্ছা মায়া ! গন্ধক, আফিং, প্রভৃতি নানাপ্রকার পদার্থ ঈশ্বর যাহা আমাদের উপকার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক লোক ঐ আফিংকে গুলি তৈয়ার করে খায় এবং রাগ করে বেশী খাইয়া মারা যায়, তাহাতে আফিংয়ের সৃষ্টি কি ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্যের ক্রুটি ? চাউল, ধান, গুড়, চিনি, আঙ্গুর, যব প্রভৃতি নানারূপ দ্রব্য ঈশ্বর জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য এই জগতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্য

বিকৃত করে, তাহা থেকে এক রকম মদ তৈয়ার করে,—সেই মদ সেই কালকূট হলাহল, পিঁপে পিঁপে প্রস্তুত করে, খাইয়া তদ্দ্বারা নানা রোগে পড়িয়া মানুষ যে দুঃখ কষ্ট ডেকে আনে, তাহাতে কি দয়াময় ঈশ্বরের শস্য সৃষ্টির মঙ্গল উদ্দেশ্যর ত্রুটি? না স্বাধীনতার অপব্যবহার দ্বারা এই সকল কষ্ট পাইয়া থাকে?

পচা গন্ধ নাকে ঠেকিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিঃশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়, নাকের সূক্ষ্ম চর্ম্মের প্রকৃতি সেইরূপ ভগবান প্রস্তুত করে দেছেন; পাছে দুর্গন্ধের বিষতুল্য পরমাণু শরীরের রক্তাধারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহক্ষয়ের পীড়া উৎপন্ন করে, সেই জন্যই নাসিকার এমনি প্রকৃতি করেছেন; এই দেখেও জানিয়া ভুগিয়া শিক্ষালাভ করিয়াও তত্রচ লোকে বাটির চার ধারে নানারূপ দ্রব্য পচাইয়া রাখে, পচাজিনিষ খায়, পচাজিনিষ তফাত করিয়া কি মাটিতে পুঁতে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া যে মেলেরিয়া ও অপরাপর নানারূপ সংক্রামক পীড়াকে ডাকিয়া আনিয়া নানারূপ কষ্ট দুঃখ ভোগ করে, তাহারা জ্ঞানের বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য সেই সব কষ্ট ভোগ করে কি না? সে জন্য জগতের নানা পদার্থ সৃষ্টির মঙ্গল উদ্দেশ্যের দোষ কি? পচা-পচিতে পীড়া হইতে পারে জগদীশ্বর কাহার প্রকৃতিতে এই ভাব প্রদান করেন নাই? তখন জ্ঞানের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া উল্টে ভগবানের দোষ না দিলে চলিবে কেন?

মা। যত দোষ নন্দঘোষ! ঘোর কলি, এ না হলে বিচারই বাকি?

দয়া। পূর্ব্বেই বলেছি যে আমরা সকল বিষয়ের মীমাংসা করতে পারি, সেই শক্তি আমাদের কোথায়? একটী আঁতুড়ে ছেলে কি সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রের পূরণ, সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের মীমাংসা, সকল দর্শনের সিদ্ধান্ত করিতে পারে কি? সেটীও যেমন অসম্ভব, সেইরূপ অনন্ত জগৎ কৌশলের মীমাংসা এই ক্ষুদ্র মনুষ্য এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কেমন করে সিদ্ধান্ত করিবে? তবে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি, এই পর্য্যন্ত দেখিতে

পাই, যত গূঢ়ভাবে সংসারের ব্যাপার দেখি, কি অনুসন্ধান করি, যত অনুসন্ধান করি সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব প্রমাণিত হইতে থাকে এবং প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে এইটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

পুথি বাড়বার আর প্রয়োজন নাই; তুমি বল দেখি একটী লোক একখানি রেলগাড়ী প্রস্তুত করে দিলেন এবং সকলে বিনা পয়সাতে ঐ গাড়িতে যাইতে আসিতে পারিবেন, এই নিয়ম করে দিলেন, পাকা পোক্ত ড্রাইভার এবং গার্ড নিযুক্ত করে দিলেন, সকল সুনিয়ম করে দিলেন, কিন্তু আরোহিগণ গার্ডের আদেশের বিরুদ্ধে, নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রভাবে, যদি লাফ্ দিয়া গাড়ি হইতে পড়িয়া যায়, তাহাতে কি রেলগাড়ির কর্ত্তার দোষ বলিবে? সেইরূপ মানুষ স্বাধীনতার, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির এবং জ্ঞান ও বিবেকের ব্যভিচারী হইয়া স্বাধীন ভাবে যে কার্য্য করেন, সে দোষ তো সৃষ্টির দোষ নহে;

মা। তিনি মানুষকে কেন এ সকল কর্ম্ম করবার ক্ষমতা দিলেন?

স। বেশ যা হোক্, তবে তিনি কেন মানুষকে পৃথিবীর মতন জড় করে দিলেন না এইটী নাকি? না বোন সে ভালই হয়েছে এই চেতনা টুকু থাকাতেই এ ঘর ও ঘর করে ভাঁড়ারের জিনিষগুলা বার্‌করে দিতেই হাঁটুতে পায়ে বেতা ধরে যায়, তখন জড় করে দিলে চন্দ্র সূর্য্যের মতন, পৃথিবীর মতন দিনরাত্র সারাখুণ্ডি ঘুরে মরত কে ভাই?

দয়া। শোক কেন? এক জনের বিশ লক্ষ টাকা আছে দেখে একজন দোতলা তেতলায় আছে, এক জনের গাড়ী ঘোড়া পাল্‌কী আছে, একজনের ধন পুত্রও লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, দেখে আমার সেই রূপ থাকিতে ইচ্ছা হল কিন্তু আমার তা ঘটে উঠিল না এই জন্যই কি শোক?

মা। তা বল কেন হবে না? এই বার একটী বেশ যো পেয়েছি।

স। তা বটেই তো! বার বার মুরগী খেয়ে বেড়াও ধান, এই বার মুরগীর বধিব পরাণ! তা বল দেখি এটাও কি ভগবানের অবিচার নয়?

দয়া। আচ্ছা তোমার মার সাতটী ছেলে ৫টী মেয়ে ১১টী পৌত্র, ৯টী পৌত্রী, দশটী দৌহিত্র ১১টী দৌহিত্রী, তিনি সকলকে সমান ভাল বাসেন সকলই তাঁর পরিবার, তবে বল দেখি হৈমু বাবুকে ময়লা কাপড় পরিতে দেখিলাম কেন?

স। সে যে গুলিখোর! যত দাও, সব বাঁদা দেয়, নয় বেচে ফেলে, সেই জন্য তার গুলিখুরী বেড়ে গেছে, তাই মা তাকে আর পয়সা, টাকাও দেন না, কাপড় ভাল দেন না; তাতেই যেন একটু রক্ষা হয়েছে, সে সেই জন্যই হোক আর পয়সার অভাবেই হোক গুলি-খোরী ছেড়েদেছে, কি বড় দাদাকে ভাল দেখে, ভাল হতে সাধ হয়েই হউক মোদ্দা গুলি ছেড়ে দেছে।

দ। তোমার ছোট ভাইটী সে দিন সন্দেশ খাবার জন্য কেঁদে বাড়ি মাথায় কল্লে, তত্রচ তাকে একটীও সন্দেশ না দিয়ে একটু যবের মোণ্ড দিলেন কেন? আর তার সম্মুখেই অন্য ছেলে নাতিদের খেয়াংরা পোরা মেঠাই দিলেন কেন?

স। তাকে যা খেতে দাও তাতেই তার পেটের ব্যাম হয়, সেই জন্য তাকে আর বিশুকে হাজার কাঁদলেও সাগুভিন্ন একটুও খুঁটে ভাল মন্দ জিনিষ তাদের হাতে দেন না।

দ। তোমার বোনঝিকে ধরে এক্‌বাটী কি খাঁয়য়ে দিলেন, আর সমস্তদিন চিংড়িপোড়া করে রাখলেন কেন?

স। সে বড়ই দুষ্ট,সে লোকের পথে যাইবার রাস্তাটীতে ভিন্ন বাহ্যে যাবে না, বোতল ভেঙ্গে গুড়য়ে রাস্তায় রেখে আসে, তার সেই দুষ্টমী ভেংয়ে সোজা করবার জন্যই তাকে আটক করে রাখেন।

দয়া। আমি তা জানব কেমন করে? তার প্রমাণ কি?

স। কেন, আমি বল্‌ছি?

দ। তুমি কেমন করে তাঁর মনের ভাব জানিলে?

স। কেন জান্ বো না। আমি তো মার কাছে সর্ব্বদাই থাক্ তুম তাতেই জানি।

দ। তবেই তো তোমার সকল কথারই উত্তর হয়ে গেল?

স। কি হল? ঢেঁকি আর কুলো না কি?

দ। ঠিক সেইরূপ ঈশ্বর, সেই বিশ্বমাতা তাঁর যে যে সন্তান কন্যার যেটী আবশ্যক তাকে সেইটীই দিয়ে থাকেন, যার যাতে সুবিধা হইবে তাহাকেই তাহা দেন, যে ব্যক্তিরা ঈশ্বর ভক্ত বা ঈশ্বরজ্ঞানী প্রেমিক যাঁহারা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সঙ্গ লাভ উদ্দেশ্য নিকটে তাঁহাকে দেখিয়া জীবন ধারণ করেন তাঁহারা সকল কার্য্যেই ঈশ্বরের অনন্তমঙ্গল উদ্দেশ্য স্পষ্ট দেখিতে পান—একে একে দুই হয় যেমন্ তেম্‌নি দেখিতে পান এবং জানিতে পারেন, আর যাঁরা দূরে থাকেন, তাঁরা তো বিপরীত ভাবে তো দেখ্‌বেনই দেখ্‌বেন, এই দেখ না কেন তোমার মার বিষয় আমি আর তুমি যেমন জানি ও জান, ঈশ্বরের কার্য্য বা উদ্দেশ্য ভক্ত প্রেমিক, বিজ্ঞানী জ্ঞানী (বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবিত্‌, ভাবুকগণ, আর ঈশ্বর অবিশ্বাস, সন্দেহ বাদীতে ঠিক পরস্পর বিপরীত ভাবে দেখেন এবং বিপরীত ভাব সন্দেহ করেন।

মা। কেমন সরস্বতী বড় যে গলাবাজী করে গিয়ে ছিলি, হল্ তো?

দয়া। আমরা হলুম ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমরা অনন্ত ব্যাপার সকলই যে বুঝ্‌তে পারব এটী কি কখন সম্ভব? তবে পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম হওয়া অবধি যত বিষয় অমঙ্গল দায়ক বলিয়া প্রথমে জানা, এবং সিদ্ধান্ত হইয়া আসিতে ছিল, ক্রমে সেই সকল বিষয়েই ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাবে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে তাহাতো একরূপ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তখন এখন যে সকল অমঙ্গল বলে ইহাতে লোকে ভুল বিবেচনা করিতেছে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইলে সেই বিশুদ্ধ

বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে সে সকলও যে অনন্ত মঙ্গল ফলপ্রদ অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্য তাহা প্রত্যক্ষীভূত কেনই না হইবে?

ম। মানুষে তত পাপই বা করে কেন? সে প্রবৃত্তি সকলওতো তিনি দেছেন? সে সৃষ্টিও তো তাঁর।

দ। তোমাকে "আত্মার স্বাধীনতার প্রকরণে" তো বলেছি যে মানুষকে তিনি স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন? ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় সকলই মানুষ নিজের স্বাধীনতা অনুসারে করে, তাহার ভাল মন্দ ফল-ভোগী হইয়া থাকে? যেমন রেলগাড়ীর মালিক রেলগাড়ীর মধ্যে বিজ্ঞাপন মেরে দিলেন, কেউ যান, গার্ডের কথায় অবহেলা না করে, এমন অবস্থায় যদি আরোহীরা গার্ডের কথা না শুনে নিজহাতে গাড়ী চালাইয়া গাড়ি উল্টে পড়ে সারা হয়, তাতে কি গাড়ীর মালি-কের দয়া এবং মঙ্গল উদ্দেশ্যের অভাব মনে করা যাইতে পারে? সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের শরীররূপ গাড়ী জ্ঞান ও বিবেক ও ড্রাইভার দিয়াছেন আমরা বিবেক ও জ্ঞানের আদেশ না শুনে যে কষ্টভোগ করি, তাহাতে ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল উদ্দেশ্য ও অনন্ত দয়ার অভাব কি এই পাপমুখে বলাযেতে পারে?

স। তিনি কেন এখনকার জন কত বি এ, এম এ ডেকে নিয়ে একটী ছোটখাট পার্লিয়ামেন্ট খুলে জগতের ছানিবন্দবস্ত করুন না, তা হলে তো জগতের কোন খুঁতই বেরুতে পারে না?

মা। আর কার সঙ্গে করুন বা না করুন সরস্বতীর সঙ্গে পরামর্শ করলে তাঁর অনেকটা আক্কেল ফিরতে পারে, কেমন না? ও লোঁ সরস্বতী! তুই যখন শিববাবুকে ধর্ম্ম থেকে ফেরাতে পেরেছিস্ তখন জগতের নিয়ম্ ফেরাতে পারবি তার আর বেশী কথা টা কি বল্ দেখি?

স। ঈশ্বর যদি আমার সেইরূপ বশীভূত হন তো কেন ফেরাতে পারব না? আচ্ছা বোন দয়া! এই পৃথিবী যদি এককালে বড় বড়

ভালুক, ও সাপের নিজস্ব স্থানই ছিল, তবে আমরাই চড়াও হয়ে তাদের বাড়িতেই এসেছি না কি? তা হলে ত আমরা বড়ই হর্জ্জুতে জীব? আমরা যখন অন্য মানুষের বাড়িতে যাই, তখন কেমন মেকু-রটীর মত মুখটী বুজে কতই যেন ভালমানুষ সেজে, বহুরূপী সেজে মান বাঁচিয়ে সুখ্যাতি কিনে নে চলে থাকি, কিন্তু আমরা যাদের দেশে এসেছি, তাদের দেশ্‌মার করি কেন? তারা যে এত দিন আমাদের সব নিশ্চিন্ত করে নাই এই তারা যে মানুষ অপেক্ষায় শান্ত জাতি ধর্ম্মভীরু জাতি—অহিংসক জাতি তাহা কি প্রমাণ হইতেছে না? আমাদের স্বার্থের জন্য তাদের সঙ্গে আমরা যেরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, তাদের স্বার্থের জন্য তারা মানুষের উপরে কিছুই অত্যাচার করে না এটী কোন মুখে না স্বীকার করিবো? বল্‌তে গেলে তাদের চেয়ে মানুষ লক্ষগুণে বেশী হিংস্র জন্তু। সাহেবেরা যেমন বলে ভারতের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসীদের মঙ্গলের এবং উন্নতির জন্যই তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, মানুষ ও ঠিক সেইরূপ ভণ করেন যে, তারা কেবল নিকৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া করিতেই পৃথি-বীতে জন্মিয়াছেন, না ভাই?

দয়া। এখন কি জাতীয় তামাসা বাড়্‌লো?

তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়াছেন, সেই জ্ঞানের মতে কার্য্য করিলে মানুষ দেবতুল্য গণ্য হয়, নচেৎ নিজ জ্ঞানের বা বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে মানুষ হিংস্রক জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীব মধ্যে পরি-গণিত হইয়া থাকে। সে কথা ত পূর্ব্বেই মীমাংসা হইয়াছে।

মা। কেবল মানুষ কেন? অনেক জীবকেই ত হিংস্রক দেখা যায়, তাদের সৃষ্টির গোড়ায় দোষ কেনই বা রহিল?

দ। মানুষ যখন উন্নত জীব-জ্ঞানীজীব হইয়াও আপন স্বার্থের জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া অল্প দিনের স্বার্থরক্ষার জন্য বা স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য, যখন জ্ঞান ও বিবেকের বিরুদ্ধে স্বজাতীয় জীবগণকে

ধ্বংস করিতে পারে, এবং প্রতি বর্ষে লড়াই ও দাঙ্গা দ্বারা সভ্যভব্য জ্ঞানী মানুষেরা যখন লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করিতে সঙ্কুচিত হন না, তখন যাহারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অজ্ঞানী জীব বলিয়া প্রমাণিত, তাহারা স্বার্থের অনুরোধে অন্য জীবের প্রতি হিংসা করিবে এটা বেশী কথা কি? নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবেরা স্বজাতীয় জীবের হিংসা করে না, কিন্তু মানুষ, জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী হইয়াও স্বজাতীয় জীবের ধ্বংস করিতেছে, ইহা অপেক্ষা মানুষের নীচতা আর কি হইতে পারে? প্রতিবর্ষে ভ্রূণহত্যা লক্ষ লক্ষ হইতেছে, এ সকল দেখে, সৃষ্টির মূলে দোষ আপাততঃ দেখা যায় সত্য, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, ঐগুলিন মানুষের জ্ঞানের এবং বিবেকের কাছে দোষ এবং অপরাধ বলে প্রকাশিত আছে কি না? যখন মানুষের বিবেকের কাছে, জ্ঞানের কাছে, উহা দোষ বলে প্রকাশ আছে তখন আর সৃষ্টির মূলে দোষ দিবার যো কি?

স। সৃষ্টির মূলে অবশ্যই দোষ আছে তিনি কেবল বানরের সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলে বেস হত, মানুষের সৃষ্টি করলেন কেন? তাই যদি করলেন তো বুদ্ধি দিলেন কেন? এইটীই তাঁর সৃষ্টির প্রধান ত্রুটি।

সর্ব্বশক্তিমান প্রকরণ।

মা। ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হইবেন তা হলে অনেক ডিম পচে যায় কেন? একটী গাছে হাজার হাজার বীচি হয়, কিন্তু তার মধ্যে অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী বীচিতে গাছ হয় না, অনেক গাছ হবার উপযুক্ত অঙ্কুর থাকে না, অনেক ছেলে গর্ভেই নষ্ট হয়ে থাকে, অনেক ধান আগুড়া পড়ে যায়, কিছুই থাকে না, এর কারণ কি? সর্ব্বশক্তিমানের সকল ইচ্ছাই তো পূর্ণ হবে, তা তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য

যখন অসম্পূর্ণ থাকে, পূর্ণ হয় না, তখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান তা কিরূপে প্রমাণ করা যাইবে ?

সর্ব্বশক্তিমান হইলে তাঁহার সৃষ্টজীবের মধ্যে এমত হিংসা এবং পাপাচার, এত অভাব, এত শোক দুঃখ কেন হয় ? তিনি যখন ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সকলই তাঁহার নিকটে বর্ত্তমান, তখন তিনি, এই সকল হবেই হবে এটী জানিয়া কেন তাহার নিবারণের উপায় করেন নাই ? এতেই বোধ হয় তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন,সেই জন্যই জগতে এত বিশৃঙ্খলা ঘটে আসিতেছে।

দয়া। এই মতটী জন্ ষ্টওয়ার্ডমিল্ প্রভৃতির মত। তা তো পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, জীবকে তিনি জড়ত্ব দেন নাই, স্বাধীনতা দেছেন, সেই জন্য তার অপব্যবহার এইরূপ ঘটিয়া থাকে, সে কথা যে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে তাতে আবার সেই কথা কেন ? সকল বীজের ফল না হওয়া, সকল জীব সম্পূর্ণ অবস্থা না পায় এইটীই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ও তখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার শক্তির অভাব বলিবে কেমন করে ? কেন যে তাহার সেই উদ্দেশ্য, তাহা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের গোচর নহে সত্য, কিন্তু অনন্তকাল সম্মুখে যখন রয়েছে, অনন্ত উন্নতি রয়েছে,কালে তাহা প্রকাশিত হইবে, পূর্ব্বে তো দেখান হইয়াছে, যে সকল বিষয় হাজার হাজার বর্ষ পূর্ব্বে লোকে কিছু জানিত না, বরং উল্টো অমঙ্গলদায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিত, এখন তাহাই মঙ্গলদায়ক স্থির প্রমাণিত হই-তেছে। যাহা তুমি অভাব বলিতেছ, তাহাই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তখন শক্তির অভাব কেমন করে বলিতে পার ? তবে সেই সৃষ্টিতে যদি অমঙ্গল ভাব দেখে থাক তো "মঙ্গলভাব প্রকরণ" দেখ সে সংশয় বিদূরিত হবে। এখন যাহা অমঙ্গল দেখিতেছ, বোধ করিতেছ, কালে তাহাই মনুষ্য সমাজে মঙ্গলদায়ক বলিয়া প্রমাণিত বা সিদ্ধান্ত হইয়া আসিতেছে, তখন আর এ বিষয়ে তর্ক কি আছে ?

মা। একটা পান্ পেতে আছে কো? এতেও কি, তর্ক আছে? এখন এ অভাব আমাদের কেন না ঘুচে? ভগবান্ কি এটী দেখ্‌বেন না?

দয়া। তোমার মা যদি তোমাকে সকল জিনিষ একেবারে না দেন, তা হলে তাঁর দেবার শক্তি নাই এটী কি বলা যেতে পাবে?

মা। তাতে তাঁর ইচ্ছা। তাতে তাঁর দেবার শক্তির কম কেমন করে বল্‌ব?

দ। সেইরূপ এখানেও কেন ধরা না যাবে? যাহা তাঁহার উদ্দেশ্য তাহাই হবে, এবং হতেছে, সেইটাই সৃষ্টির নিয়ম, কেন সে নিয়ম কর্‌লেন, তাহার এই জবাবই ঠিক যে ভালর জন্য, যত দোষ সকলই যখন প্রমাণিত হয় ভালর জন্য, তখন কালে সেটীও ভালর জন্য কেনই না প্রমাণিত হইবে?

ক। এখন আমাদের ভাল তোমার হাতে একটা পান না খেলে কেবল মুলোর ঢেঁকুর উঠছে যে?

মা। তুই কি ভাট বামন নাকি!

স। ওলো লাক টাকায় বামন ভিখারী। ওলো শূদ্রের বাড়ির মূলো খেয়েছি তার জন্যে পেটে পাক্ পাচ্চে না।

মা। মূলো কি তোমার ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়ের চৌবাড়ির খেতে চায় হয়?

অনন্ত দয়া ও ন্যায়ের সামঞ্জস্য প্রকরণ।

মায়া। আচ্ছা দয়া, তিনি বলেন যে, এই মতটি ভারি ভুল, যাঁর "অনন্ত দয়া আছে তিনি" ন্যায়বান" কেমন করিয়া হইতে পারেন? যিনি "ন্যায়বান্" তাঁহার "অনন্ত দয়া" কেমন করে থাক্‌তে পারে?

কেহ অন্যায় করিলেই তখনই যখন তাহাকে দণ্ড দিতে হইবেই হইবে—ন্যায় বিচারের জন্য কঠিন দণ্ড দিতেই হইবে, তখন অনন্ত দয়া আর থাকে কোথায়? দণ্ড মানেই কষ্ট দেওয়া তো? আর কষ্ট দিলেই জীবের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন অন্য দিগে পূর্ব্বেই বলেছ যে, জীবের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় নাম দয়া, তখন ঈশ্বর যখন ন্যায়বান্, তখন পাপীর ন্যায় বিচার করিতে পাপীকে যে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে পাপীর তো কষ্ট দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার ন্যায় বিচারের জন্যই পাপীলোকেরা কষ্ট দুঃখ ভোগ করে থাকে, তখন সেইখানেই যে ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার অভাব প্রমাণিত হইয়া থাকে, হয় তিনি ন্যায়বান, নয় তিনি দয়াময়, একটিই বলা যাইতে পারে; এই দুটী বিভিন্নভাব এক সঙ্গে কেমন করে থাকতে পারে?

দয়া। ও কথাটী একজন বিলাতের প্রধান পণ্ডিত জন ষ্টুওয়ার্ট-মিলের মত; এই মতের অনেকটা অনেককাল পূর্ব্বে আমাদের দেশেও অল্প বিস্তর তর্ক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সেই মিল্ সাহেবের মত বলে লোকে বলে থাকেন।

স। তা যারই কেন মত হউক না, ওকথাটার জবাব দাও না? তুমি কি একটাতে হার মান্‌বে না? তুমি যে হার না মান্‌লে আমাদের দুটোর হাড় মাস থাকে না দেখি?

দয়া। ঐটী তারি ভুল মত। আচ্ছা বল দেখি, তোমার খোকাকে তুমি কেমন ভাল বাস? তার কোন দুঃখ দেখ্‌তে পার কি?

মা। এ কি কখন কেহ কোন মতে পেরে থাকে যে আমি পারবো? বনের পশু পর্য্যন্ত ছেনা পোনার কষ্ট দুঃখ দেখ্‌লে চিৎকার করে সারা হয়, তখন মানুষে কি ছেলের দুঃখ কষ্ট দেখ্‌তে পারে?

দ। তবে দুঃখ কষ্ট দেখলেই পরের ভাল করার নাম দয়া, তা

হলো তোমার ছেলের উপরে তোমার অত্যন্ত দয়া আছে বলিতে হইবে?

মা। তা তো আছেই আছে।

স। ওলো আগুতো হোক, আছে না আছে তখন জাস্তে পারবি? দেদো জানে দেদোর মর্ম্ম! কাণা আলোর খবর রাখ্‌বে কি? মা ষষ্ঠি দেবতা শীগ্‌গির কোলেপীঠে আগে পাগে দিন যে তুই জাস্তে পারবি ছেলের উপরে কত দরদ হয়, কত দয়া হয়।

দ। আমাকে ঠেস্ ভিন্ন কি আর কথা নেই? আচ্ছা তোমরা যা বল্লে তাই যেন ঠিক কথা, তবে তোমার ছেলে পীলেবা যখন পরের ছেলেকে মারে ধরে তা দেখে ছেলেদের মার কেন?

স। না মারলে যে অন্যায় হয়? তার যে বুক বেড়ে যাবে? পরের অনিষ্ট করাটী অভ্যাস হয়ে যাবে, গোল্লায় যাবে বলেই মারি

দ। তবে তার মঙ্গলের জন্যই তাকে মারিয়া থাক?

মা। তাতো ঠিক কথা?

দ। তবে অত্যাচার করলে তাহাকে দণ্ড দিয়ে তাকে ভাল পথে আনাই প্রধান উদ্দেশ্য, এবং কোন মতে সে একটীও অন্যায় না করে, তার শিক্ষার জন্যই তুমি ন্যায় সঙ্গত বিচার করিয়া থাকে?।

মা। তা তো করেই থাকি।—আরও সে অন্যের উপরে অন্যায অকর্ত্তব্য ব্যবহার করা অভ্যাসটী না পাক্‌য়ে তুলে, অন্য ছেলে আবার ওরংদুষ্টামী দেখে ঐরূপ দুষ্টামী না শেখে, এই নানা ভেবে নানারূপ অনিষ্ট নিবারণ জন্যই ছেলের শাসন করা ন্যায় এবং ধর্ম্মতঃ করাইতো উচিত?

দ। আমিওতো তাই বলেছি যখন তুমি ছেলেকে মার, তাহাকে ন্যায়পথে রাখিবার জন্যে, অন্য ছেলেকে ভাল পথে রাখিবার এবং

সুশিক্ষা দিবার জন্যে তাকে মার,সে ছেলে তোমার কাছে ন্যায় বিচার দেখে তাহার দুঃখ কষ্ট দূর হবে এই সব গুলিন্ ভেবে চিন্তেই তুমি ছেলেকে ন্যায় বিচারে দণ্ড দাও তো ?

মা। কত বার বল যে ? হাঁ। দিই. দিই, দিই !

দ। যখন দণ্ড দাও, তখন তোমার ছেলের উপরে দয়া কোথায় থাকে ?

মা। কেন আমার প্রাণের ভিতরেই থাকে, আমার বুকের ভিতরেই থাকে ?

দ। কেন ? তুমি তো ছেলেকে মেরে ন্যায় বিচার কত্তে গিয়ে দয়াকে হারালে ?

মা। দয়া যাবে কেন ? তার ভাল হবে এবং মন্দপথে থেকে বাঁচবে, তার দৃষ্টান্তে আবার অন্যান্য ছেলেরা খারাপ হবে না, তারা মন্দ কাজ কর্ত্তে সাবধান হবে, তাকে সকলেই ভাল বল্‌বে— অন্যের ছেলের যে মন্দ ভাব তার উপরে হয়েছিল, তাদের মনে সে ভাবটুকু যাবে, তাদের মন্দ কুড়ুতে হবে না, এ গুলিন তো সেই ছেলের মঙ্গল উদ্দেশ্যতেই হয়ে থাকে, এ সবতো তার প্রতি দয়ার প্রধান কার্য্য, ন্যায় বিচার কল্লুম, তারই উপরে দয়া করে সেই ছেলের উপরে যে দয়া আছে ন্যায় বিচার থেকে ভাল করে সেই দয়ার কার্য্য আরতো বেশী করিলাম।

এখন বুল দেখি যে দয়া এবং ন্যায় বিচার এক সঙ্গে থাকিতে পারে কি না ? যখন তোমার ন্যায় বিচার ও দয়া এক সঙ্গে থাকিতে পারে, সেইরূপ তাঁহার (মাতৃময় ভাব পূর্ণ) অসমভাবে দয়া এবং অখণ্ড ন্যায়পরতা কেনই বা সামঞ্জস্য ভাবে এক সঙ্গে না থাকিবে ? মাতৃময় ভাব দয়া এবং ন্যায়পরতা এক সঙ্গে একই আধারে থাকিবার বাধা তো হতে পারে না ? এই তো তাহা প্রমাণ হল ? তুমিই তাহা প্রমাণ করে তো দিলে ?

ম্না। তবে তিনি এত বড় পণ্ডিত লোক হয়ে কেন এরূপ মত প্রকাশ কল্লেন ?

দ। তার একটি বেস সুন্দর কারণ আছে বিলাতের খ্রীষ্টানদের একটি পাপপুণ্যের সূক্ষ্মতার ভাব আছে, তাঁহাদের দেশে পাপ করিলে পাপীকে অনন্ত নরকাগ্নিতে অনন্তকাল পুড়ে মরিতে হইবে, কখন সে পাপী আর পরিত্রাণ পাইবে না। এই ভয়ঙ্কর ধর্ম্মমতটি বিলাতের লোকেরা ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা করিয়া থাকেন, বাল্যকালের শিক্ষা এবং অভ্যাস গুণের উন্নতি অনেক পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু বংশপরম্পরায় যে ভাবটি চলে আসে অনেক লোকের সে ভাবটুকু একেবার ধুয়ে পুঁছে যেতে পারে না; কাজেকাজে খ্রীষ্টানধর্ম্ম শাস্ত্রে ন্যায় বিচারের প্রাধান্য বেশী, দয়ার ভাবটি কম, একবার ন্যায়বিচার নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, আর দয়া তাবে ক্ষমা হইতে পারে না, এইটিই চিরপ্রচলিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, মিল মহাপণ্ডিত হইলেও সেই চিরপ্রচলিত ভাবের ভাবুক ছিলেন, সেই জন্য তিনি ঈশ্বরের মাতৃময় ভাব জগতে দেখিতে পান নাই। আর আমাদের দেশে (ভারতবর্ষ) ঈশ্বরের মাতৃময় ভাবই প্রবল, সেই জন্য হিন্দুদিগের মনু স্মৃতিরূপ প্রধান ধর্ম্মপুস্তকে "কৃত্বাপাপানি সন্তপ্য তস্মাত্ পাপাত্ প্রমুচ্যতে। নৈবকুর্য্যাম্‌পুনরিব নিবৃত্যা পূয়তেহিস॥" অর্থাৎ পাপ করে সেই পাপের জন্য হৃদয়ের সহিত অনুতাপ করিবে "আর সেরূপ পাপ করিব না" এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলে সে ব্যক্তি সেই পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পবিত্র হয়। এই স্বর্গীয় ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রমাণিত মতটি ভারত-বাসিদিগের রক্তমাংসে জড়িত আছে, সেই জন্যই ঈশ্বরের মাতৃময় ক্ষমার ভাব, ন্যায় বিচার এবং দয়ার জীবন্ত ছবি ভারতবাসীদিগের জীবনে গাথা আছে, মিল এবং মিলের দর্শন শাস্ত্র সকল এই স্বর্গীয়ভাবের কাছে, এই যুক্তিসিদ্ধ ভাবের কাছে, এই প্রত্যক্ষ

প্রমাণ তাবের কাছে উপস্থিত হইতে পারে না। এতে এইটি পর্য্যন্ত প্রমাণ হয় যে মিলের বাল্য সংস্কারের স্বভাব প্রযুক্তই তিনি ন্যায় বিচার এবং দয়া এক সঙ্গে দেখিতে পান নাই বা ভাবিতেও পারেন নাই।

স। কোন্ মিল্ সাহেব? যিনি মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য অনেক টাকা দেগেছেন? তিনি যখন স্ত্রীলোক মানেন, তখন তিনি ঈশ্বর মানেন না? তাঁর মা তো ছিল, তিনি কি নিজের মাতার হৃদয়ে "ন্যায় বিচার এবং মঙ্গল উদ্দেশ্য জড়িত গাঢ় দয়া" এক সঙ্গে দেখিতে পান নাই? এমন ছবি কাছে থাকিতেও তিনি এই মতটার, সিদ্ধান্ত কল্পতে পারে নি! এই জন্যই লোকে বলে যে "বাঁশবাগানে ডোম কাণা।"

মা! যাঁরা বই লেখেন, তাঁরা সব দেখেশুনে তন্ন তন্ন করে না লিখলে মানুষকে বৃথা হাঁপাই ঝুড়তে হয়।

দ। মিল সাহেব একজন খুব বড় লোক।

স। যেখানে খুব বড়, সেইখানে খুব ভুল; যেখানে খুব দূর-দৃষ্টি সেইখানেই নিকট দৃষ্টি কম। যেখানে খুব দাতা সেইখানেই ঘরে হাঁড়ি চন্ চন্ যেখানে খুব ধর্ম্ম, সেইখানে অন্ধতা এবং গোঁড়ামীর গন্তে ছয়লাপ, যেখানে খুব রৌদ্র, সেইখানেই খুব বৃষ্টি, তখন মিল সাহেব খুব বড়,—খুব তার্কিক, কিন্তু তেমনি দেশীয় বাল্য সংস্কারের ভ্রমে অনেক মতই ডুবে গেছেন। বলি দয়া! এখন বন একটু রাবড়ী খাওয়াইতে পারিস্? তা না হলে আর তোর সঙ্গে পাল্লাবাজী কর্ত্তে পারি না। রাবড়ী ভিন্ন আমার মনটা বড়ই ফস্ ফস্ করে। আমার তর্কফর্ক সবই রাবড়ীর মধ্যের মুকনি বিশেষ।

দ। রাবড়ী খাবে? আনাবো?

মা। কাণা ভাত খাবি হ্যা?" না হাত ধোব কোথা? অমন নোলাদাগা মেয়ে আর দুটী দেখিনি।

স। আচ্ছা দয়া যে মা ছেলেকে একটু দুষ্টমী করতে দেখলে একেবারে পুড়কে মারে সেই মাকে আর যে ঈশ্বর—অবগুণ্ড সন্তান সদৃশ মানুষের পাপ দেখলে অনন্তকাল নরকে পোড়ান ক্ষমা নামটী নাই দয়ার নামটীও নাই সে মাকে আর সে ঈশ্বরকে মা কিম্বা ঈশ্বর বলিতে ইচ্ছা করে?

দয়া। এ কথা অন্য সময়ে বলিবার ইচ্ছা আছে।

প্রবৃত্তি প্রকরণ।

মা! তিনি বলেন, এখন একটী নূতন মত বার হয়েছে যে, দয়া, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম কি রাগ দ্বেষ,—কি ক্ষুধা তৃষ্ণা যে সকল পূর্ব্বে " ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলে প্রমাণ ছিল, এখন ঐ সকল মত নূতন ডাক্তারি মতে আর নূতন বিজ্ঞান মতে সে সকল উলটে গেছে,—সেইরূপ যে চৈতন্য, জ্ঞান, বিশ্বাস, শক্তি প্রভৃতিকে লোকে একটী একটী পৃথক বিষয় বলে জান্‌তেন, এখন নূতন ডাক্তারি মতে বা বিজ্ঞান মতে ঐ সকল কেবল মস্তিকের মধ্যে যে সকল তাড়িতের ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাই ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই ভাবি, তা হলে আর আত্মাটাত্মা কি একটা উপকথা মাত্র; ডাক্তারি বই তো আর মিথ্যা নয়? সে যে অঙ্কের বই যেমন কিছুই ভুল নাই, ডাক্তারি বইও তো সেইরূপ?

দয়া! তোমাকে শিব বাবু যা বলেছেন, সে মতটা আর নূতন কি? সেটা বিলাতী মত নহে, সেই মতটি বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের চার্ব্বাক নামক একটী সম্প্রদায়ের মত ছিল, এখন বিলাতে সাহেবদের মধ্যে কেহ কেহ সেই মতটাকে রংচংয়ে করে তোল্‌বার চেষ্টা করছেন, ঐ মতটী "হারবার্ট স্পেন্সার" প্রভৃতি কতক গুলিন বিলাতী ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতের মত।

মা॥ তা হলই বা? সে মতটী কি?

দয়া। সে মতের কোন প্রমাণই নাই, কেবল একটা অযুক্তির কথা।

মা। ডাক্তারদের কথা অযৌক্তিক?

দ। কেন? ডাক্তারেরা দশ জন এক ক্লাশে একই বই, একই প্রফেসার) শিক্ষকের কাছে পড়েছেন, এক সময়ে পাস করেছেন, কিন্তু কোন একটী রোগীকে দশ সময়ে ঐ দশজনকে পৃথক পৃথক ডেকে এনে দেখাও, সেই একই রোগীর জন্য একই সময়ে সেই দশ জন দশ রকমের ঔষধির পৃক্ষপসন্ করে বলবেন, যদি ডাক্তারি বিদ্যা ঠিক হইত তা হলে ঐ দশজনের মত একইরূপ হইত। এতেই প্রমাণিক যে, ঐ ডাক্তারি বিদ্যার ঠিক নাই, প্রতি বৎসর বৎসর মত উল্টে যে নূতন মত বার হয়ে থাকে, তখন ঐ ডাক্তারি কথাতে বিশ্বাস করা যাবে কি বলে?

মা। কেন ভাই। অনেক বিষয় আছে ডাক্তারদের সকলেরই একইরূপ মত।

দ। তা ডাক্তারদের কেন? সাঁওতালদেরও মতে আমাদের মতে বিলাতী মতে এবং অন্য কথা কি? কাফরিদের মতে ইজিপ্টদের চিনেমেনদের মতে আর এণ্ডামানবাসীদিগের মতে একই রূপ ঐক্য আছে; সে কোন গুলিন? আমি তুমি যে আকাশ, তেজ, অগ্নি, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, মন্দ, ভাল, সত্যাদির প্রভৃতি প্রবৃত্তির একমত তো আছে এ গুলিন যে সার্ব্বভৌমিক মত?

মা। প্রবৃত্তির আর সার্ব্বভৌমিকত কোথায়?

দ। কেন? কিসে খণ্ডন হল?

মা। ডাক্তারি প্রমাণ দ্বারা। স্নায়ু মস্তিষ্কের বিকৃত হইলে তাহার ক্রিয়ার সহিত প্রবৃত্তির ক্রিয়াদির গতিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

দ। সে কথা যে পূর্ব্বে বলেছি, স্নায়ু বা মস্তিষ্ক প্রভৃতি জড়-শরীরের যন্ত্র মাত্র, সেই যন্ত্র যখন অকর্ম্মণ্য হয়, তখন জ্ঞান, চৈতন্য বা দয়া প্রভৃতি প্রবৃত্তি তাহাকে পরিত্যাগ করে, কিম্বা কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলেও যেমন ভাঙ্গা যন্ত্র না বাজিলে বাদক তাহা পরিত্যাগ করে, শরীর বিষয়েও ঠিক সেইরূপ, এই তর্কের উপরে কে কি বেশী প্রমাণ দেন তা তো দেখিতেই পাই না, তখন সেই নূতন মতকে প্রামাণিক বলিব কেমন করে? বাসা ভেঙ্গে গেলে পাখী উড়ে যায়, তাই বলে পাখী আর বাসা একই বস্তু, কেমন করে প্রমাণিত হইবে? অতএব ঐ মতটী নিতান্ত অপ্রমাণিক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ।

মা। তবে কোন কোন শিরা কাটিলে জ্ঞান থাকে না কেন?

দয়া। সে তো সেই একই কথা নিয়ে ভাঙ্গা যন্ত্রে বাদক সহস্র ঘা দিলে, বাজালে সে যন্ত্র কি বাজে? যন্ত্র তিরেই যেমন যন্ত্রীর কার্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের উপকরণ দ্বারাই প্রবৃত্তির বা জ্ঞানাদির কার্য্য প্রকাশ পায়; যেমন যন্ত্র নষ্ট হলেও যন্ত্রী যন্ত্র ফেলে চলে গেলেও যন্ত্রীর অভাব বা অস্তিত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না সেইরূপ প্রবৃত্তি, ও স্নায়ু আদির শরীর সম্বন্ধে ঠিকই সেই একই প্রকার নিয়ম।

সরস্বতী। ও পুরণো কথা আর ভাল লাগে না ও কথা তো একবার শেষ হয়ে গেছে, ওটা আর মত নহে, কেবল একটা ফাঁকা অনুমান,—"অপ্রমাণিক, অনুমান ভিন্ন আর কিছুই তো বলা যায় না।' কে কে আছেন এই তর্কের পুরো জবাব দিন দেখি?

দ। তবে আর ওটা একটা মিথ্যা আবদারে কথায় মাথা বকিয়ে কাজ কি?

স। সেই ভাল বল্? এখন আমার আগে দয়ার বোঝা পড়া হবে তুই বল্ একটু চুপ্ কর (চেপেসিজডউন্) কর।

মা। তোমার মুখে ছাই কথার রকমের। আবার ইংরেজি বাত ঝাড়া হয় যে?

অনন্ত আশা প্রকরণ।

মা। আচ্ছা, দয়া! সাধু, অসাধু, ধনী, দুঃখী, রোগী অরোগী প্রায় সকল লোকেই তো বলে থাকেন, এই পৃথিবী মহা কষ্টের স্থান; এই পৃথিবী, যন্ত্রণার আকর ভূমি, তার কারণ কি?

দ। মানুষের দূরাশা এই পৃথিবীতে পূরণ হয়না বলেই, লোকে ঐরূপ বলে থাকেন।

মা। আচ্ছা, যে দৌড়দার আশা এই পৃথিবীতে পূর্ণ হবার যো নাই, ঈশ্বর জেনে শুনে মানুষকে তেমন প্রবল আশা দিয়ে, মানুষের এতকষ্ট, যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে দেছেন কেন? তিনি যখন সর্ব্বান্তর্যামী, তিন কালের খপর তিনি জানিতেছেন, যখন মানুষের ইচ্ছা আশা, এই পৃথিবীতে চরিতার্থ হইবে না, তখন এই পৃথিবীর উপযুক্ত আশা এবং ইচ্ছার বল করে দেন নাই কেন?

দ। "অমর" এই কথার মানে কি?

মা। অমর মানে, "হনুমান!" তাও কি ছাই আমি জানি না? এই যেমন আমাদের আত্মা অমর—মানুষের আত্মা অমর; যার ধ্বংস নাই অনন্তকাল যা থাক্‌বে, তাকেই অমর বলা যায়।

দ। এখানে এখন ঐ কথাটী থাক; আচ্ছা, বলদেখি, তোমার ছেলে প্রিয়নাথের জন্য তুমি যে নূতন পাকা বাড়ীটী প্রস্তুত করেছ, তাতে লোহার থাম,—লোহার কড়ি দিয়ে এত পাকা পোক্ত করেছ কেন? বাঁশের খুঁটী, আঁবের কড়ি দে, মাথাগুঁজে কাল্‌কাটাবার মত তৈয়ার কর্‌লেও তো কর্‌তে পার্‌তে?

মা। তা হলে দুমাসেই ঘুণধরে পড়ে যাবে যে? খুব টেঁকসই হবে, অনেক দিন থাকিবে বলেই পাকাপোক্ত করেছি।

দ। তবে জান তো, যেটা অনেক দিনের জন্য, সে জিনিষটাকে পাকা পোক্ত করে প্রস্তুত কর্‌তে হয়।

মা। তা না জানিলে করবো কেন ?

দ। সেইরূপ জানবে, ঈশ্বর যে সকল মানবাত্মাকে অমর করে সৃষ্টি করেছেন, যে সব মানবাত্মা অনন্ত কাল স্থায়ী করে সৃষ্টি করেছেন, সেই সকল আত্মার অঙ্গ শীঘ্র নষ্ট অথবা ধ্বংস হয়ে অল্পদিনের মধ্যে ফুরাইয়া না যাইতে পারে তাহার উপযুক্ত করেই মানবাত্মা সকলকে সংগঠিত করেছেন। এই পৃথিবীতে মানবাত্মা সকলের আশা, ইচ্ছা সকল যদি ফুরাইয়া যাইত, তা হলে আর আত্মার অমরত্ব কোথায় থাকে ? তা হলে সকল আত্মা যে এই পৃথিবীতেই মরিয়া যাইত,—ধ্বংস হইয়া যাইত ? যেমন বাড়ি ঘরের কাট খুঁটী গাঁথুনি কাঁচা হলে শীঘ্রই পড়ে নষ্ট হয়ে যায়,—তেমন শরীরের রক্ত ফুরাইলে শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সেইরূপ আত্মারও আশা এবং ইচ্ছা, ফুরাইয়া গেল এই পৃথিবীতেই যে সকলের আত্মা ধ্বংস হয়ে যেত, তার কি বল দেখি ? যেমন শরীর ছাড়া রক্ত থাকিতে পারে না, এবং রক্ত ছাড়া হয়ে শরীর থাকিতে পারে না, তেমনি আত্মা ছাড়া হয়ে ইচ্ছা, আশা থাকিতে পারে না, এবং ইচ্ছা, আশা ছাড়া আত্মাও থাকিতে পারে না। যেমন অনেক দিনের জন্য যে বস্তুটীকে প্রস্তুত হয়, সেটীকে যেমন বেশী পাকা পোক্ত করা আবশ্যক, সেইরূপ আত্মা সকল যখন অমর, তখন আশা এবং ইচ্ছা সকলকে ক্ষয়শীলা এবং পৃথিবীর উপযুক্ত অল্পকাল স্থায়ী কম্‌পোক্ত করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? যেমন অনেক কাল টেক্‌সই হবে বলে মানুষে যে সকল পাকা গাঁথুনি পাথরের ঘর তৈয়ার করেন, তাতে সজনা কাঠের কড়ি বরগা দিতে পারেন না, সেইরূপ অমর আত্মা সকলের এই পৃথিবীর উপযুক্ত ক্ষয়শীলা আশা কিম্বা ইচ্ছা মানুষকে ঈশ্বর প্রদান করেন নাই। যেমন রক্তের বলে জীবের শরীর রূপ কলগুলি, নড়ে চড়ে উন্নত এবং কার্য্যক্ষম হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে আশা এবং ইচ্ছা বিশিষ্ট মানবাত্মা সকলের যে নিরাকার আধ্যাত্মিক দেহ, একমাত্র আশা এবং ইচ্ছা (শরীর সম্বন্ধীয়

রক্ত সদৃশ) আত্মা সকলের অনন্ত উন্নতির প্রধান উপাদান। যেমন রক্ত সতেজ এবং পরিষ্কার থাকিলে শরীর সকল সবল এবং উন্নত হইতে থাকে, সেই আশা এবং ইচ্ছা সকল সৎপথে, নিয়মিত পথে, সাধুভাবে পবিত্রভাবে মিলিত থাকিলে মানবাত্মা সকল ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করতে থাকেন। কোন রূপ অন্যায় কার্য্য দ্বারা শরীবের রক্ত বিকৃত হইলে, শরীরও যেমন বিকৃত হয়ে যায়, সেইরূপ আশা কিম্বা ইচ্ছা বিকৃত হইলে, কিম্বা অন্যায় পথে গেলে মানবাত্মা সকলও বিকৃতাবস্থা, মলিনাবস্থাও প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। পুনরায় ঔষধাদি দ্বারা এবং নিয়মিত পথে চলে শরীর যেমন স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অন্যায় পথে পাপ পথে গমনশীলা আশা এবং ইচ্ছা ন্যায়পথে পবিত্র পথে পুনরায় উপস্থিত হলে, মানবাত্মা সকল সেইরূপ স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা অথবা শান্তি সুখের আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে; চিন্তা করিলে এই গুলি আপনার হৃদয় মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়। দয়াময় মঙ্গলালয় ঈশ্বর অল্পকাল স্থায়ী শরীর বৃদ্ধির উপযুক্ত রক্ত সকল জীবকে প্রদান করেছেন, এবং অন্যদিগে জীবের শরীর গুলিকে পরিমিত রক্তের আধার করে সৃষ্টি করেছেন, সেইরূপ অনন্তকাল যে সব মানবাত্মা অবিনাশী হয়ে বেঁচে থাক্‌বে,—অমর হয়ে থাক্‌বে সেইসব আত্মার অনন্ত কালের সঙ্গের সঙ্গী হবার উপযুক্ত অসীম অনন্ত আশা এবং ইচ্ছাকে মানবাত্মার অঙ্গ স্বরূপ করে দেছেন। অনন্তকাল যে আশা এবং ইচ্ছা মানবাত্মার সঙ্গের সঙ্গী হবে, সে আশা এবং ইচ্ছা, এই পথের চটির স্বরূপ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে পূরণ হবে কেমন করে? 'পূরণ' তো এক রকম শেষ সীমাকেই বলে, তা জান? মানবাত্মা সকলের যখন শেষ সীমা নাই, তখন সে আশা এবং ইচ্ছা এই পথের চটী স্বরূপ পৃথিবীতে পূরণ করিবার বাঞ্ছা করাটীও যে অসুখ বৃদ্ধির কারণ, দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি করাইবার কারণ, তাতে আর আশা ইচ্ছা প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তার অপরাধ কি? ঈশ্বর

দয়া করে যে সব মানবাত্মাকে অনন্ত কালের অনন্ত সুখ শান্তি প্রদান করিবেন, যদি সেই সব মানবাত্মার আশা এবং ইচ্ছা এই পৃথিবীতেই ফুরাইয়া যাইত তা হলে মানবাত্মা সকলকে অনন্ত সুখ শান্তির দিকে টান্ ধরাত কে? যদ্যপি দয়াময় ঈশ্বর মানুষের আত্মা সকলের আশা, ইচ্ছা অল্প দিতেন, তাহলে মানুষের আশা ইচ্ছা এই পৃথিবীর আঁব কাঁঠাল খেতে খেতে—চাপকান প্যান্টলুন ঢাকাই জামদানী আংটি, জশম পর্‌তে পর্‌তে আর মদ শোর গরুর বংশকে নির্ব্বংশ কর্‌তে কর্‌তেই যে মানুষের আত্মার সব আশা এবং ইচ্ছাটুকু ফুরাইয়া যাইত, তার কি বল দেখি?

মা। তবে মানুষের আশা এবং ইচ্ছা এই পৃথিবীতেই সকল সুখ চাহে কেন?

দ। তোমার প্রিয়নাথ, যখন চাঁদ দেখে বলে "মা! কিও? চাঁ, দেনা, হাম্ কর্‌বো?" একটা ঝাড় দেখে বলে, "দেনা, খাবো" তখন তুমি কি তাকে ঐ সকল হাম্ কর্‌তে দাও? ঐ সকল তার হাম্ করবার কি জিনিষ? সে যখন, তার ইচ্ছামত, আশানুরূপ জিনিষ না পেলে কেঁদে কেটে হাট্‌পাকায়, তখন তুমি তার সেই সকল আশা বা ইচ্ছাকে কোচিছেলের আবদার মনে করে হাস কি না? কিম্বা যদি তুমি প্রিয়নাথের এবং সুশীলার জন্য একমাসের খাবার কতক গুলিন ভালমন্দ জিনিষ একেবারে কিনে রাখ, আর যদি প্রিয়নাথ এক দিনেই একা খেতে আব্‌দার করে, সে সহস্র অব্‌দার কর্‌লে তুমি তাকে ইচ্ছামত,—আশামত সেইগুলি দিয়ে থাক কি?

মা। তা দিলে সে খেতে পার্‌বে কেন? বেশী খেলে তার যে পীড়া হইবে?

দ। তবে এক সঙ্গে একমাসের জিনিষ পত্র কিনে রাখ কেন?

মা। তাদেরই ভালর জন্যে রাখি; তাদের যার যেটুকু দরকার

তাই বুঝে, যতটুকু খেলে তাদের অসুখ হবে না, ততটুকুই তাদের দেব, বেশী দেব কেন ?

দ। তবে, বিশ্বমাতা তাঁর পুত্র কন্যাদিগের সুখের জন্যই তাঁর অনন্ত জগৎ ভাণ্ডার সাজায়ে রেখেছেন, ক্রমে অনন্ত কালে যাহার যা আবশ্যক বুঝিবেন, তাঁকে তাই ক্রমে ক্রমে অনন্তকালে দিবেন, তা সেই সকল সুখ যাঁরা একেবারে পাইতে ইচ্ছা অথবা আশা করেন, তাঁদের সেইরূপ আশা এবং ইচ্ছাকে কোচিছেলের আব্দার ভিন্ন আর কি বলা যাবে ? আরও তোমাকে একটী জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রিয়নাথের জন্য যে সব জিনিষ রাখ, তোমার মেয়ে সুশীলা যদি সে জিনিষ নিতে আব্দার করে, তা কি তুমি তাকে সে সব দে থাক ?

মা। তা কি কখনও দিতে পারি ?

দ। তবে যে সকল সুখের দ্রব্য অন্য পুত্র কন্যার জন্য বিশ্বমাতা রাখিয়াছেন, সেই বস্তু যদি অপর সন্তান পাইতে ইচ্ছা অথবা আশা করে আব্দার করেন, তিনি দেবেন কেন ? বিশ্বমাতার সন্তানগণের সুখ শান্তির দিগেই দৃষ্টি আছে, তাঁর সন্তান কন্যাগণের বৃথা আব্দার পূরণ জন্য তো তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে। আরও শুন,—কোন দূর-দেশে অথবা কোন তীর্থযাত্রা কালে কেহ যদি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পথে যেতে যেতে যে চটীতে কি সরায়ে অথবা যে বাজারে তাঁরা উত্তরে থাকেন সেই বাজারে যত ভাল ভাল জিনিষ পত্র থাকে, তাই দেখে তাঁদের সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঐ সকল বাজারের ভালমন্দ সকল জিনিষ পত্র লুটে নিতে আব্দার জুড়ে দেয়, পাঁচটার স্থানে দশটা পেলেও তাদের আশা বা ইচ্ছা পূরণ অথবা তাদের মন উঠে না ; সেই চটীর অপেক্ষা ভাল ভাল সহর আরও আছে এবং তাতে আরও ভাল ভাল সকল সুখের আনন্দের জিনিষ আছে, তা তাদের মনের কোনেও ঠাঁই পায় না, সেই সামান্য চটীর দোকান সাজান দেখেই তারা ভুলে যায়, মনে করে

তেমন জিনিষ পত্র আর কোথায় নাই ; অন্য ভাল সহর থাকা, তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্থান, সেইরূপ এই সব কোটি কোটি মানবাত্মা, এই অনন্ত পথের চটী স্বরূপ এই ক্ষুদ্রে পৃথিবীর সামান্য সামান্য সুখের জিনিষ দেখে ভুলে গিয়ে, এই পৃথিবীর সামান্য সুখের জিনিষপত্র সব নিতেই আশা, ইচ্ছা অথবা আব্দার আরম্ভ করে। তাতে যেমন সহস্র আব্দার কর্‌লেও ঐ সকল পিতা মাতা অস্ফুট বুদ্ধি সন্তানগণকে সহরের পর ভাল সহরে, তার চেয়ে ভাল স্থানে নিয়ে যেতে থাকেন, ছেলেমেয়েদের কোন আব্দারেই যেমন কর্ণপাতও করেন না, সেই রূপ স্নেহময়ী বিশ্বমাতা, দয়াময় বিশ্বপিতা তাঁর কোটি কোটি মানবাত্মা, গুলিকে এই চটির স্বরূপ এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখে ভুলে থাক্‌তে নাদিয়ে নানা লোকের সঙ্গে নিয়ে যান, এবং ছেলে মেয়ে গুলিকে নানারূপে সুখ শান্তি প্রদান করেন।

শ্যা। তা—তা, তা তো অধিকারেই আছে।

দ। আরও তোমাকে একটী কথা বলি,—মাতা যদি কোটি কোটি ছেলে মেয়েকে বেস্ সুন্দর খেলাঘর বেঁধে দিয়ে, আর অপব পাঁচটী ছেলে মেয়েকে আনিয়া তাহাদের সহিত স্যাংয়াত, গোলাপ,—লেবেণ্টার—গাঁদা—সই—বেগুণফুল,—মকর, গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ পাত্‌য়ে দেন, তারপরে ঐ ছেলেরা ঐ খেলা ঘর পেয়ে ভুলে গিয়ে ঐ খেলা ঘরের মধ্যেই প্রকৃত সংসারের সুখ পাইতে ইচ্ছা কিম্বা আশা করে, সেই সব ছেলেদের আশা অথবা ইচ্ছা সকল, মাতা কি পূরণ করেন ?

শ্যা। সে সকল তো বৃথা আব্দারের কথা মনে করেন।

দ। তবে, এই পৃথিবীরূপ খেলাঘরে, যদ্যপি বিশ্বমাতার নিকটে এক সঙ্গে সব সুখ,—সব সম্পত্তি, এই কোটি কোটি মানবাত্মাগণ পাইতে আশা অথবা ইচ্ছা করেন, তা হলে সেই সব আশা অথব ইচ্ছাকে আব্দার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

মা। এই যে প্রাচীন মানুষদের আত্মা, তাও কি কোচি ?

দ। জগন্মাতার নিকটে,—অনন্ত কালের নিকটে, মানবাত্মাগণ তো নিতান্তই কোচি, তার আর ভুল কি ? যদি কোন লোক দশকোটি বৎসর বাঁচে, তার পক্ষে দুই এক শত বর্ষ নিতান্ত আঁতুড়ের সময় বলা যায় কি না ?

মা। তা ধর্‌লে দু একশ বছর তো তুলকরে দুদ্‌খাবার কালই ধর্‌তে হবে।

দ। বৃদ্ধ হলেও মানুষের আত্মা সকল কেন সংসার ভুলতে পারে না ? ছেলেরা যেমন খেলাঘরকে ভুল্‌তে পাবে না, মানবাত্মা সকল নিতান্ত কোচি কোচি অপরিপক্ব জ্ঞানী বলেই পৃথিবীরূপ খেলা ঘরকে বেশী ভাল বাসেন।

মা। তবে মানুষে এত জ্ঞানের বিদ্যার, বুদ্ধির, অর্থের, ধর্ম্মের, মানের, মর্য্যাদার অভিমান করেন কেন ?

দ। তাঁদের ঠিক্ খেলা ঘরের ছেলের হেঙ্গাম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মা। আচ্ছা,—পৃথিবীর মাতাগণ, তো কোচি ছেলেরা যা আব্‌দার করেন তা তো দিয়ে থাকেন।

দ। যে সকল বিদ্‌কুটে আব্‌দারে ছেলে, একটী ঘোঁড়া দেখে বলে ;—"মা ! দেনা, ঘোঁড়া খাবো.—হাম্ করবো।" চাঁদ দেখে বায়্‌না যুড়ে দিয়ে বলে,—"মা ! চাঁদ দেনা, হাম্ কর্‌বো।" এরূপ সহস্র আব্‌দার করলেও কি তাহাদের স্নেহময়ী মাতা ঐ সকল সেই ছেলেদের হাম্ কর্‌তে দিয়ে আব্‌দার পুরণ করে থাকেন ? তারা যদি ঐ ইচ্ছামত আশা অনুরূপ চাঁদ, ঘোঁড়া হাম্ কর্‌তে না পেয়ে মাথাখুঁড়ে, কেঁদে কেটে হাট্‌পাকায়ে চুল্‌ছিঁড়ে একাছত্তি একালাপ করে, তত্রচ তাদের সেই স্নেহময়ী মাতা কি সেই আবদারে ছেলেদের আব্‌দার রক্ষা করে থাকেন ?

মা। কেন, কিছু কিছু আব্দার শুনেন তো?

দ। হাঁ শুনেন বটে, যাহা দিলে ছেলের ক্ষুধা শান্তি হবে, যাহাদিলে পীড়া পিড়া হবে না, বরং তাতে তার ভালই হবে মঙ্গলই হবে, এমন জিনিষ দিয়ে থাকেন; স্নেহময়ী হিসাবী মাতাগণ হরগিচ্ একটুকুও কুপথ্য ছেলে মেয়েকে দেন না। ছেলে মেয়ে যদি একটা আঁবের স্থানে দুটা চায়, তাহা তাদিগকে দেন, কিন্তু সেই ছেলে মেয়ে যদি একটা গাছের সকল পাকা আঁব খেতে বায়না করে, তাকি মাতা দিয়ে থাকেন? অথবা পীড়িত সন্তানকে কিম্বা ছেলে মেয়ের পীড়া বৃদ্ধি হইবার কোন রূপ আশঙ্কা বুঝিলে সেই ছেলে মেয়েকে সহস্র ইচ্ছা সহস্র আশা করিলেও সহস্র আব্দার করিলেও, একবিন্দুও কিছু খাবার দিয়ে থাকেন কি? বাড়াবাড়ি দেখ্‌লে প্রলোভনের স্থান হইতে সে ছেলে মেয়েকে সত্বরে নিয়ে অন্য স্থানে (যেখানে কুপথ্যর উপযোগী সামগ্রী নাই) এমত স্থানে নিয়ে গিয়ে থাকেন তা জান তো? তাতে যদি সেই ছেলে মেয়ে কেঁদেকেটে গালাগালি দিয়ে ভূতভাগ্য়ে দেয়, তাতে সেই স্নেহময়ী মাতা হাসেন বৈ আর কি করেন? সেইরূপ "চাঁদ খাবো" গোচের আব্দার যে সকল ছেলে মেয়ে বিশ্বমাতার নিকটে করেন, তাঁদের আব্দার সেই স্নেহময়ী বিশ্বমাতা পূরণ করবেন কেন? স্নেহময়ী দয়াময়ী মাতা সন্তান কন্যার যাতে মঙ্গল হবে সেইটীই যেমন চেষ্টা করেন, সেই মঙ্গল করাই যেমন তাঁর একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, সেইরূপ ঈশ্বরের যেমন অখণ্ড দয়া আছে, তেমনিই অনন্ত-মঙ্গল উদ্দেশ্যও আছে তাঁর দয়াই মঙ্গলেপূর্ণ, তাঁর স্নেহ মঙ্গলেপূর্ণ যে মানবাত্মার যাহা হইলে মঙ্গল ফল ইহলোকে পরলোকে হইবে, যাহাতে আত্মার মঙ্গল হইবে, তিনি তাহাবে তাহাই প্রদান করেন।

মা। আচ্ছা, বিশ্বজননী মা তো সবই কর্‌তে পারেন। ছেলের

বৃথা আবদার বা আশা, ইচ্ছা করিতে পারিবে না, এমন নিয়ম তিনি করে দিতে পারিতেন তো?

দ। আবার সেই কথাই এসে পড়েছে। আচ্ছা তোমাকে অন্যরূপে বুঝায়ে দেতেছি। ঈশ্বর মানুষের আত্মা সকলকে স্বাধীন করে দিয়েছেন তা জান? চন্দ্র, সূর্য্য একই নিয়মে চলিতেছে, বর্ষায় বৃষ্টি হবে, সূর্য্যের এবং পৃথিবীর গতি অনুসারে শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা হয়ে থাকবার নিয়ম করে দেছেন,—শরীর সকলের রক্ত মাংস, অস্থি প্রভৃতি ক্রমশঃ আহার আদির দ্বারা বৃদ্ধি হইবে, ঐরূপে তাহার বাড় বৃদ্ধির নিয়ম করে দেছেন, সেইরূপ মানুষকে নিয়মের অধীন করলে যে, মানুষের আত্মা সকল জড় হইয়া যাইত? তা হলে মানুষের আত্মার তো আর প্রয়োজন হইত না? তা হলে মানুষ যে কলের পুতুল হয়ে যাইত? তা হলে মানুষে যে সুখ শান্তি বুঝিতেই পার তো না?

সরস্বতী। ও বন! তাঁর ঘাট্ হয়েছে যে, তোমার স্বামী প্রভৃতি ডেকে একটী পার্লিয়ামেণ্ট সভা করে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; তা হলে আজ তাঁকে নিকাসের দায়ী হইতে হইত না? হাঃ তোর বিলাতী মত!!

মা। সুদু বিলাতীদের দোষ দাও কেন? সে কালে মুনি ঋষিরাও তো এই পৃথিবীকে দুঃখের স্থান, কষ্টের স্থান বলে, শাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন, তার কি?

দ। মুনি ঋষিরা শাল দোশাল অভাব দেখে, গাড়ী ঘোঁড়ার আতর গোলাপের অভাব দেখে, সোণাদানা ঢাকাই বারানসীর অভাব দেখে, কোট্ প্যান্টুলুন, মদ, গাঁজা, গুলি প্রভৃতির বাজার মাগ্গি দেখে ঝাড় লাণ্ঠন,—চিনের সরা ভাঁড় প্রভৃতির অভাব দেখে, পৃথিবীকে কি দুঃখ কষ্টের স্থান বলে গেছেন? তা নয়, তাঁরা এই পৃথিবীতে মানুষ কর্ত্তৃক পাপাচার বৃদ্ধি হতেছে দেখে;—মানুষ ঈশ্বরের আদেশ

মত কার্য্য ছেড়ে, আপ্ত খোদী হয়ে অন্যায় আশা, কুইচ্ছা, নানা প্রকার পাপাচার করে থাকেন দেখেই, তাঁরা সেই জন্যই পৃথিবীকে দুঃখ কষ্টের স্থান বলে গেছেন, তাও কি বুঝ্‌তে পার নাই?

মা। এই পৃথিবী কি তবে সত্য সত্যই দুঃখ কষ্টের স্থান নহে?

দ। তা তো নয়ই নয়; যাঁরা পৃথিবী দুঃখ কষ্টের স্থান বলে, লোকের সম্মুখে বড় বড় হাউই ছোড়া গোচ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে মরে গেলে অজ্ঞান হয়ে দাঁত্‌কপাটী লেগে সারা হন কেন? তাঁরা ভাজেন ঝিংয়ে, বলেন পটল; যাঁদের মুখেতে সংসার দুঃখময়, কিন্তু তাঁদের হৃদয়ের মাঝে সংসার এই পৃথিবী সুখময় বলে আঁকা আছে; সেই জন্য ছেলে পিলেকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে পৃথিবী ছাড়িতে দেখিলে, একেবারে দশদিক্‌ অন্ধকার দেখে বসেন!! তাঁদের হৃদয়ে যদ্যপি সংসার দুঃখময়, কষ্টময় বলিয়া বাস্তবিকই দৃঢ়বিশ্বাস এবং জানা থাকিত তাহলে ছেলেপিলে আত্মীয় অন্তরঙ্গকে এই দুঃখময় কষ্টময় পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে দেখিলে আহ্লাদে আট্‌খানাই হইতেন। ছেলে পিলেকে আত্মীয় বন্ধুকে যন্ত্রণাময় জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ কর্‌তে দেখ্‌লে কান্না পায়, না আহ্লাদ হয়? যখন সংসারকে ছাড়্‌তে দেখ্‌লে কান্না পায়, তখন সংসার যে সুখের স্থান—পৃথিবী যে সুখের আধার সেটী তাঁদের জীবনে চিত্রিত হয়ে আছে, এটী স্পষ্টই ধরা পড়ে যায়।

মা। তা তো বন! ঊটী সকল পক্ষে খাটে না, এই যে লোকে আত্মঘাতী হচ্ছে?

দ। যাঁরা আত্মঘাতী হন, তাঁরা আত্মঘাতী হইবার পূর্ব্বে একরূপ পাগল হয়ে উঠেন, সেটী আর আমার ঘরগড়া কথা নহে, বড় বড় ডাক্তারেরা এই মত প্রকাশ করেন, সেই রোগের নাম (ইন্‌সেনেটি)। তা হলে তাঁরা প্রকৃতিস্থ লোকের উদাহরণের স্থলে গণ্য হইতে

পারেন না। যাঁরা প্রকৃতিস্থ, তাঁদের কথা বল, তাঁরা পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে চান না কেন? ছাড়্‌বার নাম শুন্‌লে, ভয়ে আড়ষ্টে মরেন কেন? তবে এই মাত্র ঠিক্ কথা, যে মানুষের যেরূপ আশা, এবং ইচ্ছা, এই পৃথিবীতে সেরূপ সুখ শান্তি পাওয়া যায় না; সে জন্যও অনেক সময়ে মানুষের মনে পৃথিবীকে দুঃখ কষ্টের স্থান বলে মনে হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এই পৃথিবীতেও সুখ শান্তি বড় কমও নাই। মানুষ, কষ্ট এবং দুঃখর হিসাব রাখিতে বেস শিক্ষা করেছেন, কিন্তু সুখের হিসাবটী প্রায়ই রাখেন না, সেই জন্য কষ্ট দুঃখের হিসাবের খাতাতে মানুষের সর্ব্বদাই নজর পড়ে, সুখের শান্তির খাতা রাখেন না, সেই জন্য সুখ শান্তির হিসাব দেখ্‌তেও পান না। তুমি কাল্‌কার কত দুঃখ পাইয়াছ, এখনই গড়গড় করে বলে যেতে পার্‌বে, কিন্তু কল্য যত সুখ শান্তি আনন্দ পাইয়াছ, (বড় বড় ঘটনা ভিন্ন) আর বল্‌তে পার?

মা। হাঁ, তা সত্যিই তো, যদি সুখের হিসাবই দেখ্‌তে না পান, তবে মর্‌তে চান না কেন? তা হলে সুখ গো মনেও থাক্‌তে পারে না? মনে সুখ অবশ্যই থাকে।

দ। মনে না থাক্‌লে হল কি? তুমি জান, হৃদয় খাতা খানি ফটগ্রাফার যন্ত্র স্বরূপ? প্রতি দিন মানুষের যে সকল সুখ শান্তি উপস্থিত হয়, সহস্র নিশ্চেষ্ট থাকিলেও আপনা আপনি ঐ সুখশান্তি, হৃদয়ে আঁকিয়া থাকে; যখন "মরণ" কথাটী স্মরণ হয়, সেই সময়ে এই পৃথিবীতে আজীবন কাল যত সুখ ভোগ শান্তি ভোগ হয়ে থাকে, এবং ভবিষ্যতে আরও কত সুখ শান্তি লাভ হতে পারে, তখন তাতে নজর পড়ে যায়, আর অমনি আঁত্‌কে উঠেন! ভেবে দেখ দেখি, এই পৃথিবীতে কত শত রূপ ভালমন্দ খাবার সুখ, স্ত্রীপুত্র স্বামী প্রভৃতির পরস্পর ভালবাসার সুখ, পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুবান্ধবে সহিত আলাপ স্নেহ মমতা ভক্তি প্রেম প্রভৃতির সুখ, তাঁহাদের সহিত

সর্ব্বদা সহবাসের সুখ, সাধু আলাপের সুখ, ধর্ম্ম কর্ম্মের দান ধ্যানের সুখ শান্তি, দয়া, ভক্তি, ন্যায় সত্য অনুষ্ঠা প্রভৃতি সুখশান্তি যতরূপ সুন্দর বস্তুদর্শন, নানারূপ সুন্দর কথা শ্রবণ, নানা রকম সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ প্রভৃতির সুখ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন, এবং নানারূপ সুন্দর কথা শ্রবণ, নানা রকম সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ প্রভৃতির সুখ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন, এবং নানারূপ হাসি খেলার সুখ, নূতন নূতন বিদ্যা, জ্ঞান, প্রভৃতির উপার্জ্জনের সুখ, খাওয়া পরা খাওয়ান উপকার পাওয়া উপকার করা প্রভৃতির সুখ, এইরূপ কতশত প্রকার সুখ মানুষে এই পৃথিবীতে প্রত্যেক দিনে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং চিরকাল ধরে যে সব সুখ উপার্জ্জন করে আসেন, প্রত্যেক দিনের দুঃখ কষ্টর তালিকার নীচে ঐ সকল প্রত্যাহিক উপার্জ্জিত সুখ শান্তির অঙ্কপাত করে ঠিক্‌দিয়ে, বাকীকেটে দেখ দেখি, তা হলে এখনই দেখিতে পাবে, এই পৃথিবীতে কষ্ট দুঃখ অপেক্ষা কোটিগুণে সুখশান্তি আনন্দ অধিক ফাজীল হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ সকল সুখের ভাব অলক্ষিত ভাবে অযত্নেও স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে চিত্রিত হয়ে থাকে বলিয়াই কোন মতেই পৃথিবীকে ছাড়িতে রাজী হয়েন না; সেইজন্য মানুষ এই পৃথিবীতেই আশা এবং ইচ্ছার অনুরূপ সকল সুখশান্তি এক সঙ্গেই পাইতে ইচ্ছা করে না। তুমি একটী গলদ্‌কুষ্ট রোগীকে বল দেখি "মর";—একমাত্র সোণার চাঁদ-কুড়ো ছেলে মরেগেছে, স্বরূপ কার্ত্তিক সমান্ পণ্ডিত ভালবাসার আধার স্বরূপ স্বামীকে বিসর্জ্জন দেছেন, আপনি রোগে শোকে জর জর হয়ে দুটী চক্ষুকাণা হয়েছে, পেটের অন্নে গেঁটের সোণাতে বঞ্চিত হয়েছেন, এমন একটী স্ত্রীলোককেও "মর" বল দেখি;—একশ বছর বয়সন্উল্‌টে গেছে, তিন মাথা এক হয়েছে, রোগে শোকে পুত্রপৌত্র বিয়োগ শোকে জীর্ণশীর্ণ হয়েছে, চোখ কাণ বুজে গেছে, এমন লোক্‌কে "মর" বল দেখি, কেমন্ তোমার প্রতি তাঁরা সন্তুষ্ট হন?

ঐ "মর" কথাটী তেমন এক জনকে বলে দেখ দেখি তাঁরা কেমন না দুঃখিত হন? তাঁরাও মুখ বিকৃত না করে আহ্লাদ প্রকাশ কেমন করেন, ঐ "মর" কথাটী বলে দেখ দেখি? ঐতেই স্পষ্ট ধরা পড়ে যায়। যিনি যতই কেন এই পৃথিবীকে দুঃখ কষ্টের স্থান বলুন না, কিন্তু এই পৃথিবী, এই সংসার তাঁদের হৃদয়ে সুখের, আনন্দের স্থান বলে আঁকা আছে, এবং এই সংসারের সুখময়ী ছবি তাঁদের হৃদয়েই, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়েই চিত্রিত হয়ে আছে। বাস্তবিকই এই সংসারের মধ্যে নিগূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয়ে অনুসন্ধান করলে এই সংসারে কষ্ট, দুঃখ অপেক্ষা সুখের ভাগ লক্ষ লক্ষগুণ বেসি, সেটী স্পষ্টই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মা। তা সত্যি বন! মর্‌তে কেহই রাজি হয় না; মরণের ইচ্ছা অথবা আশা কোন প্রকৃতিস্থ মানুষে প্রায় মনের সহিত করেন না।

দ। তার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল সুখের স্থানটীকে ছাড়বার নাম "মরণ" এই ভেবে মরণের নাম শুনে মানুষে আঁতকে উঠেন! মানুষের প্রকৃতি কোন মতেই দুঃখকে চাহে না,—সুখকে কোন মতেই ছাড়িতে রাজি হয় না; পৃথিবী বাস্তবিক দুঃখের স্থান হইলে, ছাড়িতে সকলেরই ইচ্ছা হইত; পৃথিবী সুখের আধার বলেই মানুষে, পৃথিবীকে, সংসারকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। যেমন খেলাঘরকে সুখের স্থান মনে করে, খেলাঘরের সই, স্যাংয়াতকে আপনার প্রাণের লোক ভেবে, তাদের ছেড়ে থাকিতে ছেলেরা ইচ্ছা করে না; সেইরূপ কোটি কোটি মানবাত্মাগণ, এই পৃথিবীকে সর্ব্ব সুখের আধার ভেবে, এই পৃথিবীতেই বন্ধু বান্ধবের সহিত এক সঙ্গে চিরদিন থাক্‌তেই ইচ্ছা এবং আশা করে থাকেন।

মা। ও বন! আশার কি কুল কিনারা আছে?

স। দেখ মায়া! তোমাকে একটী বেসি কথা বলি; মানুষের

ইচ্ছা এবং আশা, আর বাঁশ ঝাড়, এই দুটী উপমা, পরস্পর বেস খাটে; বাঁশের যেমন কঞ্চি এবং কোঁড়া হয়ে, ঝাড়টীকে যেমন প্রকাণ্ড করে তুলে; মনের মধ্যে আশা এবং ইচ্ছা সকলের শাখা প্রশাখা বাহির হয়ে মনরাজ্যকে একবারে আশা এবং ইচ্ছার জঙ্গল করে তুলে; বাঁশ গাছ পরস্পর বেস একত্রে না থাক্‌লে যেমন একটু ঝড় লাগ্‌লেই অমনি ভূমিতে পড়িয়া লণ্ডভণ্ড হয়, ইচ্ছা এবং আশা যদি পরস্পর মিল না থাকে, তাহলে সংসার প্রলোভনরূপ ঝড়ের বলে পাপ অধর্ম্ম রূপক্ষেত্রে পড়ে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। নূতন বাঁশঝাড়ে যদ্যপি ঠেক্‌না না দেওয়া হয়, তা হলে একটু ঝড় লাগ্‌লেই যেমন সেই বাঁশঝাড় পড়ে যায়, এবং লোকের পথের চিহ্ন স্বরূপ হয়, সেইরূপ যুবা বয়সে আশা এবং ইচ্ছা সকলকে ঈশ্বররূপ খুঁটিতে ধর্ম্মরূপদড়িদ্বারা না বাঁধিতে পারিলে সামান্য মাত্র প্রলোভন ঝড়ে আশা এবং ইচ্ছা সকল ছিন্ন ভিন্ন ও বিকৃত হয়ে আপনার এবং অন্যের ধর্ম্মপথের গতি রোধ করে ফেলে। বাঁশ ঝাড় যেমন পরস্পরে মিলিত থাকিলে প্রাচীনকালে সেই বাঁশ সকল হইতে উৎকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন হইয়া জগতের উপকারে আসে, সেইরূপ মানুষের ইচ্ছা এবং আশা ধর্ম্মরজ্জুতে ঠিক্ বাঁধা থাকিলে, সেই আশা এবং ইচ্ছা সকল দ্বারা জগতের মনুষ্য সমাজের, কল্যাণ সাধন হয় এইটী স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

প্রকৃত ও বিকৃত বিশ্বাস প্রকরণ।

সরস্বতী। আচ্ছা দয়া। বিশ্বাস কি কখন ছাড়তে আছে? তোমরাই তো বল "বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল" তবে আমাদের এতকালের পুরুষানুক্রমের ধর্ম্মবিশ্বাসকে কেমন করে ছাড়তে পারি? যদিচ সে বিশ্বাসের মধ্যে কিছু মন্দ থাকে তা ছাড়তে গেলে যে আদার স্বত্ত্ব খুঁইখাড়ার সঙ্গে চলে যাবে, তবে তার কি বল দেখি ?

দয়া। ছেলেবেলা তোমার মা তোমাকে ভাল বাসিতেন, এ বিশ্বাসটী তোমার ছিল তো?

স। সে বিশ্বাস তো মানুষ-মাত্রেরই থাকে, তখন আমার ছিল তা আর বল্‌তে কইতে কি?

দ। আচ্ছা, বল দেখি, ছেলে বেলায় ছেলেদের মাতাগণ আপন আপন ছোট ছোট ছেলেকে "ঐ ভূত। ঐ জুজু!" বলে যে সকল ভয় দেখাইয়া থাকেন, সেই সকল কথাতে ছেলেদের প্রগাঢ় বিশ্বাস হয় কি না?

স। তা তো আমাদেরই ছেলেবেলা বিশ্বাস হত; তখন অন্য লোকেরও যে সেইরূপ বিশ্বাস হত, তাতে আর ভুল কি?

দ। মাতা ভাল বাসিতেন, আর মাতা "ভূত-জুজু কাণকাটার ভয় দেখাতেন, এই দুটীতেই ছেলেদের পাকা বিশ্বাস থাকে, এটী স্বীকার করত?

স। এ তো সকল ছেলেরই থাকে, এমন কি আমাদের তো ছিল।

দ। আচ্ছা, বল দেখি, এখন তোমার সেই জুজু, কাণকাটা প্রভৃতির বিশ্বাসটী আছে, না গেছে? আর ছেলে বেলা তোমার মা তোমাকে যে ভাল বাসিতেন, সে ভালবাসার উপরে এখন বিশ্বাস আছে কি না?

স। জুজু এবং কাণকাটাটীর বিশ্বাস কোন্‌কালে মন থেকে চলে গেছে, মার ভালবাসা যে কি পরম পদার্থ ছিল, তা সে ভালবাসার ভাব এখন রোজ রোজ মনে বৃদ্ধিই হচ্ছে; তাঁর ভাল বাসার মতন আর কি কেউ ভূভারতে ভালবাস্‌তে পারবে? তাঁর ভালবাসার উপরে দিন দিন বিশ্বাস তো বাড়্‌তেছে।

দ। জুজু আর কাণকাটাটীর বিশ্বাস গেল কেন?

স। যখন বেস জ্ঞান হল, মার সেকথাটী মিথ্যা, কেবল আমাকে

ভয় দেখাবার জন্য,—কেবল আমাকে শান্ত করে রাখ্‌বার জন্য, কেবল আমাকে দুদ খাওয়াইবার জন্য; কেবল আমার বাহেনা নিবৃত্তি করায়ে ঘুম্‌ পাড়াইবার জন্যই সেরূপ মিছি মিছি ভয় দেখাইতেন, এখন সেই জ্ঞানটী হওয়াতেই, সে বিশ্বাস ঘুচে গেল, মার ভালবাসাটী সত্য বলেই, এখন যত জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্চেছে, ততই সে বিশ্বাসটী বাড়্‌ছে।

দ। মার ভয় দেখানে কথা সেই কাণকাটা, জুজুতে মিথ্যা জ্ঞান হওয়াতে, যেমন সেই বিশ্বাসটী ত্যাগ করতে পেরেছ, আর মার ভালবাসাটী যেমন সত্য বলে জ্ঞান হওয়াতে সেই বিশ্বাসটী যেমন দিন দিন বাড়িতেছে সেইরূপ যে বিশ্বাসের মধ্যে ভ্রম, মিথ্যা যতটুকু আছে; সেই ভ্রম মিথ্যা টুকু ছেড়ে দিলে হানি কি?

স। তা হলে মার সঙ্গে ঢাকী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন যাবে যে? ভাল বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত চলে যাবে যে, তার কি বল দেখি?

দ। তা যাবে কেন? যেমন, মার কথাতে ভালবাসা; এবং কাণকাটা, জুজুর ভয়, এই দুই বিশ্বাসই ছিল, কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার সেই কাণকাটা, জুজুর কথা গুলি মিথ্যা বোধ হওয়াতে সেই বিশ্বাস টুকু ছেড়ে দেছ, এবং সেই বিশ্বাস টুকু ছেড়ে দিয়েও মার ভালবাসার প্রতি আরও বেসি বিশ্বাস দিন দিন বাড়ছে; সেইরূপ সত্য বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ভ্রম, কুসংস্কার মিশ্রিত আছে সেই সব ভ্রম কুসংস্কার প্রভৃতিকে ছেড়ে দিলে, সত্যের প্রতি বিশ্বাস কেন চলে যাবে? বরং দিন দিন সত্যের প্রতি বেসি বিশ্বাস বাড়িতেই থাকিবে। যদ্যপি ভ্রম বিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে সত্য প্রকৃত বিশ্বাস পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইত, তা হলে কাণকাটা, জুজু প্রভৃতির কথায় অবিশ্বাস হইবার সময়ে মার ভাল বাঁসাতেও একেবারে ঘোর অবিশ্বাস হয়ে যেত যে?

স। তা সত্যই বল বটে!

মা। আঃ রাম্ বাঁচলুম্! ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা হল! আমি মনে করে ছিলুম, হয় তো সরস্বতীর মুখদে, ভাদ্রকৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তীথির বাণডেকে, ঠাট্টার তরঙ্গ বাহিবে; আর দয়া ভেসে যাবে।

অজ্ঞেয় প্রকরণ।

মা। আচ্ছা দয়া! কোন কোন বিলাতী মতে "ঈশ্বর, অজ্ঞেয়" তাঁহার বিষয় কিছুই বলা যায় না, তখন যে সকল লোক তাঁহার বিষয় লইয়া বৃথা বাদানুবাদ তর্কবিতর্ক করে, তাহা বৃথা কল্পনা এবং ভ্রমের মত লইয়াই গোলমাল করেন। জগতের কৌশল দেখিলে একটী মূলকারণ টাকা প্রমাণ হয়, কিন্তু তাহা অজ্ঞেয়, অর্থাৎ তাঁহার বিষয় কিছুই জানা যায় না।" এ মতটী কি?

দ। এ মতটী এখন বিলাতের হারবার্ট, স্পেন্সার বলে একজন দর্শন শাস্ত্র লেখকের মত বলেই অনেক সভ্য লোকে তাঁহার শিষ্য হতেছেন, কিন্তু ঐ মতটীও আমাদের দেশে "ভারতবর্ষে" নূতন নহে, তিনি এ মতটী নূতন প্রকাশ করেন নাই। ভারতবর্ষে কোন মতই নূতন বলে গণ্য হইতে পারিতেছেন না; তবে কি না বিলাতী পণ্ডিতেরা বেস ডাল পালা দে নূতনের মতন সাজয়ে দিয়াছেন, ভারতে পূজ্যপাদ ঋষিদের মতেও "ঈশ্বর অগম্য, ঈশ্বর অপার, ঈশ্বর অগ্রাহ্য, ঈশ্বর অসঙ্গ. ঈশ্বর অব্যয়, ঈশ্বর অশ্রাব্য, অবোধ্য, অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য অবাক ইত্যাদি ভূয়োভূয়ঃ বলে রেখেছেন, এমন কি তাঁহারা ঈশ্বরকে বা প্রথম কারণকে "অবাঙ্ মনসোহগোচরম্" অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অগোর বলে গেছেন, তখন এই মতটী নূতন নহে এইমতটী ভারতের পুরাতন মত।

মা। ত তো ভারতের পুরাতন মত যেন হলোই কিন্তু তা হলে আর সে কথার কি কোন অন্যমত নাই? তা হলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কোথায়?

তা হলে "ঈশ্বর ধ্যাতব্য, ঈশ্বর শ্রোতব্য, ঈশ্বর স্মর্ত্তব্য, ঈশ্বর চিন্তিতব্য এই সকলের মানেন কি? তা হলে যাহা চিন্তার অতীত, অজ্ঞেয়, তাঁর সাধনা তাঁর যোগাচার তাঁর তপস্যা তাঁর ভজন সাধন কি?

দ। ঐ মতটী সম্পূর্ণ ঠিক নয়, সকলের মধ্যে ঐ মতটী খাটে না; তিনি জ্ঞানের গম্য নহেন, ভাবের গম্য নহেন, "তাহাকে আমি জানি যে এমতও নহে, না জানি যে এমতও নহে," (১)—এই কথাটী, এই সিদ্ধান্তটীর মধ্যে যে একটী অতি সূক্ষ্মভাব সূক্ষ্ম জ্ঞান—সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির বিষয় রহিয়াছে, প্রথম কারণ বা ঈশ্বর কেবল সেই দৃষ্টিতেই উপলব্ধি হইয়া থাকেন।

মা। কৈ বিজ্ঞান তো সে কথা স্বীকার করে না?

দ। জড় বিজ্ঞান, সেখানে যাইতে পারে না; ঐ কথার অনেক দূরে জড় বিজ্ঞান পড়ে থাকেন। সেই জন্যই জড়বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ মূল কারণ, বা প্রথম প্রিন্সিপেল, বা ঈশ্বর বা জগত স্রষ্টাকে কেবল জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবার জন্যই "অজ্ঞেয়" এই মতটীকেই রক্ষা করিতে চাহেন। ইয়ুরোপে অদ্যাপি "ভাব বিজ্ঞান" কিছু মাত্র পরিপক্ক হয় নাই, "ভাববিজ্ঞান" ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ ঋষিদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ সমালোচিত হইয়াছিল, এবং "ভাব বিজ্ঞান" তাঁদের মধ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল এই সকল শ্লোক বা শাস্ত্রের দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

মা। ভাল, "ভাব জ্ঞান, ইচ্ছা" এইতিনটী যখন আত্মার অঙ্গ তখন প্রত্যেক মানুষেই আত্মা থাকাতে, প্রত্যেক মানুষের ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছার ধারাবাহিক রীতি, নীতি বা ক্রিয়া কর্ম্ম একইরূপ হইবে, তখন ভারতবর্ষের ঋষিদের ভাব কি বিলাতের পণ্ডিতদের নাই? তা হলে তাদের কি আত্মার প্রধান অঙ্গ "ভাব" তা নাই?

দ। কেন, থাকবে না? ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা, মানবাত্মা বা মনুষ্য মাত্রেরই আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত সমানরূপ আছে; তবে যে

মানুষ যেরূপ ঐ সকল ভাব জ্ঞান ইচ্ছার কিম্বা মোট কথা আত্মারই উৎকর্ষণ সাধন করেছেন, তাঁরা সেই সকলের উন্নতি সাধন ও করেছেন এবং এখন করছেন। এক জন কানা যেমন বন্দুক প্রস্তুত করিতে শিখেছেন, এক জন তাঁতি যেমন কাপড় বুনতে শিখেছেন, এক জন বি, এ, এম, এ, এল, এল, ডি, সেরূপ কাপড় বুন্‌তে, সেরূপ বন্দুক তৈয়ার করতে কদাচ পারবে না। বিলাতে অদ্যাপি কাশ্মীরি সাল করতে পারছেন না; এত চেষ্টাতেও মুরশীদাবাদের কাশিমবাজারি চেলির মতন চক্‌চকে রেশমের কাপড় প্রস্তুত করতে পারছেন না, ভারতবাসীদের মতন পিতা মাতাকে ভক্তি কর্‌তে পার্‌ছেন না;—সেরূপ যোগসাধনা আদৌ জানেন না, ইহার কারণ কি? কেবল এই সকল বিষয়ের ক্রমশঃ উৎকর্ষসাধন জন্য ভারতবর্ষে ভাববিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছে, বিলাতের লোকদের জড়বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে বহুকাল হইতে অধ্যবসায় সহিত চেষ্টা করাতে জড়বিজ্ঞানেরই উৎকর্ষসাধন হইতেছে, তাঁহাদের সেই জন্য ভাববিজ্ঞানের নিকৃষ্টতা এবং সেই জন্যই তাদের জ্ঞান অপেক্ষা ভাব সঙ্কীর্ণ; কাযেই আত্মার প্রধান অঙ্গ ভাবই তাঁদের এ পর্য্যন্ত উৎকর্ষসাধিত হয় নাই, সেই জন্যই তাঁরা "অজ্ঞেয়" ভাবটীই যেন বুঝিতেছেন "জ্ঞেয় ভাবটুকু গ্রহণ করিতে সে প্রকার সক্ষম নহেন।

মা। তবে কি ঈশ্বরকে বা প্রথম প্রিন্সিপেলকে জানা যায়?

দ। তা তো বল্লুম, "জানি যে এমত নহে, না জানি যে এমতও নহে," এইটীই প্রকৃত কথা।

মা। জানি যে এমত নহে, এ তো বিজ্ঞান মতে প্রমাণিক, আর না জানি যে এমত নহে, তাহার প্রমাণ কি?

দ। যাহার জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের ইচ্ছার সমান উৎকর্ষসাধিত হইয়াছে, সেই তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন, আর সেইরূপ মনু-

যাই তাহা গ্রহণ করিতে বা জানিতে পারেন,, যাহাদের তা হয় নাই, তাহারা বুঝাইবেই বা কেমন করে? সে উপদেশ দিবেই বা কেমন করে? আর উপদেশ দিলেও বুঝ্‌বেই বা কেমন করে? এ পক্ষে গুরু শিষ্য উভয়ের আত্মারই জ্ঞান, ইচ্ছার সঙ্গে সমান ভাবের উৎকর্ষসাধন সাপেক্ষ যে যেমন চক্ষুর তারা এবং পাতা থাকলেও চক্ষুর পুত্তলিকায় কোন বিঘ্ন ঘটিলে (ছানিপড়িলে) যেমন দেখা যায় না সেইরূপ জ্ঞান ইচ্ছায় উৎকর্ষ থাকিলেও ভাবের উন্নতি না হলে ঈশ্বর দর্শন চলে না।

মা। তবে পনের আনা তিন পাই তিন ক্রান্তি যে এই উৎকর্ষ-সাধনে বঞ্চিত।

দ। কে বলিল? ভাবে মানুষ বঞ্চিত হতে পারে? এটী মানবীয় আত্মার মধ্যে একেবারে অস্বাভাবিক কথা। যেমন ভাব জ্ঞান ইচ্ছা এই তিনটী লইয়া আত্মা বা তিনের সমষ্টিকে আত্মা বলা যায়, কিম্বা আত্মাতে এই ভাব জ্ঞান ইচ্ছা আছে, তখন মানব আত্মা মাত্রেরই উহার একটী একেবারে অভাব হতে পারে না।

মা। ভাল কতকগুলি লোক ঐ ভাবে ঈশ্বরকে জানে কেন আর অপর অনেকেই সেই ভাব থাকাতেও জানিতে কোন মতেই পারে না, বর্গ বিসর্গ অনুভবও করিতে পারে না কেন?

দ। তুমি অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখেছ তো? তাহার কি কাঁচের গুণে ঐরূপ দেখা যায়, না কাঁচ প্রস্তুতের গুণে ঐরূপ দেখা যায়? এক দিগ্ দেখ্‌লে বহু দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায়, অতি ক্ষুদ্র বস্তুও বৃহৎ দেখা যায়, অন্য দিগে দেখ্‌লে, নিকটের বস্তু দূরে দেখা যায় অতি বড় বস্তু ক্ষুদ্র দেখায়, এখন বল দেখি কেন এই ঘটনা হয়? কাঁচ তো একই স্বচ্ছ বস্তু, তবে এ ঘটনা কেন হইল?

মা। সে তো কাঁচের উঁচু নীচু ঘষার জন্য, প্রস্তুতের জন্য ঐরূপ দেখায়। উহা আর কাঁচের গুণ নয় তাহা প্রস্তুতের কৌশল মাত্র।

দ। এতেও ঠিক সেইরূপ, ঐ রূপ কাঁচে কেবল দৃশ্য বস্তুর প্রকৃতত্ত্ব অনুভাব হয়; দূরত্ব বা নিকটত্বর প্রমাণ জন্য ঐ কাচের উদ্দেশ্য নয়; সেইরূপ মানবাত্মার "ভাবই" জ্ঞানের সঙ্গে সমান উৎকর্ষ সাধন না হলে অজ্ঞেয়বাদ উপস্থিত হইতেই পারে। তবে জ্ঞানকে যিনি যেরূপ মার্জ্জিতকরিয়া থাকেন, তিনি ঈশ্বর তত্ত্ব সেইরূপ জানেন জড়তত্ত্ব সেরূপই বুঝেন, যাহার জ্ঞান উন্নত তিনি জড়ের কার্য্য জড়ের গুণ খুব নিকটে দেখেন, যাহার জ্ঞান অপেক্ষা ভাব বেশী তিনি ঈশ্বরকে খুব নিকটে দেখেন, এই দুটীতেই আংশিক ভ্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু যেমন স্বচ্ছ কাঁচে জ্ঞান বা দূরে ছোট বা বড় কিছুই ভ্রমাত্মক দেখা যায় না, সেইরূপ যাঁহাদের জ্ঞান এবং ভাব সমান উৎকর্ষিত হইয়াছে, তারাই ঈশ্বরকে"জানি যে এমনও নহে, না জানিবে এমতও নহে, এই মহান সত্যের নিকটে উপস্থিত হন, এই স্থির বিজ্ঞানই প্রথম প্রিন্সিপেলকে "জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয়" এই সন্ধি স্থলে আনয়ন করে। জড়বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, ভাববিজ্ঞান,এই তিনটী সমান উন্নত যেখানে নাই, সেখানে এই উচ্চ আদর্শ সত্য অনুধাবনই হইতে পারে না। জড়বিজ্ঞান উৎকর্ষিত হইলে "অজ্ঞেয়বাদ উপস্থিত হইবে, আবার ভাববিজ্ঞান উৎকর্ষিত হইলে "জ্ঞেয়বাদ উপস্থিত হইবে, কেবল মাত্র জড়বিজ্ঞানের উৎকর্ষভাবে অজ্ঞেয়তা উপস্থিত করাবে" সেইরূপ কেবলমাত্র ভাববিজ্ঞানের উৎকর্ষতাতে নানারূপ সাকারত্ব উপস্থিত করাইবে, এই দুটিই অবশ্যম্ভাবী ফল। আর যদি অনাদি জড় বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভাববিজ্ঞান সমভাবে উৎকর্ষিত হয়, তা হলে প্রথম প্রিন্সিপেলে অজ্ঞেয়, এবং জ্ঞেয় "ঈশ্বরকে, জানি যে এমতও নহে সে না জানি যে এমতও নহে," এই স্থির সিদ্ধান্তে এবং অসংশয় লক্ষ্যতে উপনীতহবেন।" আর এই মতটীই সকল বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে, কোন বিজ্ঞানেরই সঙ্গে বিরোধী ভাব সংলগ্ন হইতে পারে না।

স। কেন পারে না? গৃহেনা বিজ্ঞান বলেন, মেয়েমানুষের

পুজা ভিন্ন আর সকলই অগ্রাহ্য, সকলই অজ্ঞেয় সকলই অনর্থক সকলই অসার; এই বিজ্ঞানের নিকটে গণিত বিজ্ঞানও অসত্য প্রমাণিত হইতেছে, এই বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রমাণিত "এই সংসার ধোঁকার টাটী গহেনা বিনা সব মাটী! নারীপুরাণ,—অবলাবেদের ব্যবস্থা, যে পুরুষ এই বেদ পুরাণে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন, তিনি গরম গরম সকার নরকস্থ হন, কুন্দল সাগরের জলন্ত ঢেউতে পুড়তে থাকেন।

মা। ঈশ্বর যে "জ্ঞেয় সে টুকুর প্রমাণ কি?

দ তা তো বল্লুম, বুঝানা বা বুঝা দুই জনের ভাবের জ্ঞানের উৎকর্ষিত না হলে অজ্ঞেয় বাদ এবং জ্ঞেয় বাদ দুইটীতে কুসংস্কার বা ভ্রম ভ্রান্তি মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে পড়ে, জ্ঞান এবং ভাবের উৎকর্ষ সাধন বিনা বুঝাইতে বা বুঝিতে কেহই পারেন না।

মা। তবেই তো অজ্ঞেয় হইতেছেন?

দ। তা কেন হবেন? আমাদের জ্ঞানের ভাবের যাহা গোচর নয় তাহাই কি "অজ্ঞেয় বলিতে হইবে? সূর্য্য সৃষ্টি বা জগত্ সৃষ্টি কেন হইল? এই কারণ আমরা কখন জানিতে বা বুঝিতে সম্পূর্ণ-রূপে পারিব না, তাই বলে এই জগত্ সৃষ্টির কারণ নাই বলিতে হইবে? এই যে আকাশমণ্ডলে কোটী কোটী গ্রহউপগ্রহ,—হরি-তালিকার মধ্যস্থিত শত শত সৌরজগত কতক প্রত্যক্ষ,কতক অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে, যেটি দেখিতেছি, তাহারই অস্তিত্ব স্বীকার করিব? আর যে সকল অলক্ষিতভাবে গ্রহ আছে তাহা অজ্ঞেয় বলিব কি?

দ। সূর্য্য যেমন সৌরজগতের জনক বা জননী, সূর্য্যের অংশ হইতে এই পৃথিবী শুক্র, নেপচুন, হর্ষেল, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি যেমন সূর্য্যের অংশ হইতেই সংগঠিত প্রমাণিত হইতেছে এবং সূর্য্য যেমন ঐ সকল গ্রহকে আকর্ষণ করে রেখেছেন সেইরূপ সূর্য্যকে বা ঐরূপ আরও সৌর জগতকে আবার কোন বৃহৎ গ্রহ আক-

র্ষণ করে রহিয়াছেন,—সেইরূপ যে সকল প্রত্যক্ষীভূত গ্রহ নক্ষত্রময় জগত রহিয়াছে, সেই সকলকে মনুষ্য দৃষ্টির বহির্ভূত অথচ অলক্ষিত গ্রহমণ্ডলী আকর্ষণ করিয়া নিজ কক্ষাভিমুখে নীচাইতেছে। এটী প্রত্যক্ষ গোচর না হইলেও কার্য্যকারণ অক্ষধরে প্রামাণিক বলা যাইতেছে; সেইরূপ জগতের কার্য্য কারণ নিয়ম সকল দেখে, ঈশ্বর অজ্ঞেয়, বা প্রথম প্রিন্সিপেল একেবারে অজ্ঞেয়, এই মতটী যে ভ্রান্তিমূলক মত, তাহা সিদ্ধান্ত হইতেছে। এখন " মূল কারণ প্রকরণ " দেখ, তাহার সঙ্গে সকল মীমাংসা পাইবে।

মা। ঐ মতে "কজ" (Cause) "এবং য়্যাব স্লুট (Absolute) "ইনফিনিট" (Infinite) অর্থাৎ "কারণ" "স্বাধীন" "অসীম" এই তিনটী এক সঙ্গে থাকিতে পারে না।

দ। আমার শক্তি, আমি স্বাধীন, এবং আমার কৃতকার্য্যের কারণ আমি, এই তিনটী মত এক সঙ্গে ত থাকা প্রমাণিক,তখন ঈশ্বর সমক্ষে তাহাই সমানভাবে থাকা অপ্রমাণিক কেনইবা হইবে? আমরা দেখি তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে যখন অল্প পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে এই তিনটি বিষয় সামঞ্জস্য হইতেছে, তখন ঈশ্বরের অনন্তভাবে সেই গুলিন বর্ত্তিবার কারণ কি? সর্ব্বশক্তিমান প্রকরণ, মূল কারণ প্রকরণ" "অনন্ত দয়ার ও ন্যায়বানের সামঞ্জস্য প্রকরণ" গুলিন মিলাইয়া দেখ; এই সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা ঐ সকল প্রকরণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

মা। "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে মিলন, এইখানে যে ভিত্তি," জগত যে ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়" স্পেনসর ফাষ্ট প্রিন্সিপেল ৪৬ পৃষ্ঠা এই কথার জবাব কি?

দ। এই কথার তো জবাব বা মীমাংসা হয়েছে। "জগৎ যে ক্ষমতা প্রকাশ কর্‌ছে এ কথা স্বীকার কর্‌লে আর "অজ্ঞেয়, এই মতটী থাকে কোথায়? জগৎ যে ক্ষমতা প্রকাশ কর্‌ছে, সেই ক্ষম-

তার যতটুকু জানা যায়, ততটুকুই তাঁর ক্ষমতা জানা গেল যে? তুমি সেক্‌সপিয়ারকে কালীদাসকে খ্রীষ্টকে চৈতন্যকে জান কেমন করে? তাঁদের ক্ষমতার মধ্যে ভাব যতটুকু তাঁদের কার্য্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তাতেই তোমরা তাঁদের জান্‌ছ, সেইরূপ জগতের মধ্যে যে ক্ষমতার পরিচয় পাচ্ছি, সেই ক্ষমতা টুকুতেই সেই ঈশ্বর বা ফাষ্ট প্রিন্সিপেলের পরিচয় পাচ্ছি, তাতেই তাঁকে জান্‌তে পাচ্ছি তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় কেমন করে বল্‌বে? যাহার কোন কার্য্য বা ভাব জানা যায় তাঁহাকে "অজ্ঞেয়" বলা যাইতে কদাচই পারে না, যাহার ক্ষমতা বা ভাবের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাতেই "অজ্ঞেয়" বলা যাইতে পারে, এমত স্থলে "অজ্ঞেয়বাদ" যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিমূলক তাহা সিদ্ধান্ত হইতেছে।

স। সিদ্ধান্ত কি হল? শূদ্রের মুখে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বল্‌তে নেই।

মা। কি আমার বাম্‌নি লো! বিশকুট খেয়ে বামনের বড়াই দেখলে!

স। অলো! ব্রহ্ম অগ্নিতে সব ভস্ম হয়ে যায়!

মা। তবু ভাল বেহ্ম নামটা কল্লে?

স। তাত করি। প্রাণখুলে ব্রহ্মনাম করিব।

প্রকৃতি পুরুষ প্রকরণ।

মা। আচ্ছা দয়া! প্রকৃতি পুরুষ কি? এই মতটী তো আমাদের দেশে খুব প্রচলিত? প্রকৃতি পুরুষ হতেই এই সংসার বল আর জীব জন্তুই বল, আর লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহ, এবং হরিতালিকাস্থিত ক্ষুদে ক্ষুদে নক্ষত্র কি মেষ, বৃষ, মিথুন, প্রভৃতি বা (গ্রেট্ বিয়ার) প্রভৃতি নক্ষত্র মালা, কি শত শত সৌরজগৎ বা সকল জড়জগৎ, জীব জগৎ, দেবজগৎ সকল আধ্যাত্মিকজগৎ ঐ প্রকৃতি পুরুষ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, এইটীই তো প্রধান মত?

স। এতো আমাদের ভগবদ্গীতার মত আমাদের দেশের সাংখ্য দর্শনের মত, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের মত, যেমন মা বাপ হতেই ছেলেপিলে হয়, সেইরূপ মহাশক্তি আর মহাদেব হতেই সব জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, অথবা মহামায়া, মহাদেব হতেই কিম্বা অবিদ্যা আর হিরণ্যগর্ভ হতেই এই জগৎ সংসার উৎপন্ন হয়েছে। ও মতটী সাংখ্য-দর্শনের মত; তা থেকেই ভাগবদ্গীতা, আর অপরাপর মত প্রকাশ হয়েছে। ঐ মতটীর প্রকৃত অর্থ এই যে, জগতে যে অন্ধ শক্তি আছে, বা পরমাণু আছে, তাহাও অনাদি অনন্ত, এবং এক চৈতন্য শক্তি আছে, বা জ্ঞান শক্তি আছে, তাহাও অনাদি অনন্ত, ঐ চৈতন্য শক্তি আর পরমাণু, কিম্বা জ্ঞানশক্তি আর পরমাণুর সঙ্গে যে অর্থ শক্তি আছে, ঐ দুই বিষরূপ শক্তির যোগেই তাবৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বা জগতের জীবজন্তু গাছ পালা শাক সোবজী তরিতরকারি হইতে গ্রহ উপগ্রহ সৌর জগৎ হরিতালিকা বা ছায়াপথে যে দুই কোটির বেশী সূর্য্য অপেক্ষাও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বড় জন্তু গ্রহাদি যাহা ভাবনা চিন্তার অতীত ব্যাপার—ঐ সকল পদার্থ এবং তাঁহার মধ্যে যত কিছু আছে, এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক জগৎ উৎপন্ন হয়েছে।

স। এটী তো বেস কথা! একা মা, বা একা বাপ হতে কি কখন সন্তান উৎপন্ন হতে পারে?

দ। মা, বাপের মধ্যে তো একটী জড়, আর একটী চৈতন্য নয়? দুয়েতেই জড় এবং চৈতন্য সমানভাবেই আছে, দুয়েতেই শক্তি এবং চৈতন্য বা জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই সমতুল্য আছে,জড় সৃষ্টির মধ্যে তো আর জ্ঞান ও চৈতন্য দেখা যায় না? তা হলে সকল জড়জগতেরই চেতনা বা জ্ঞান থাকিত? যেমন পিতা মাতার চৈতন্য ও শক্তি বা জ্ঞান ও শক্তি থাকাতেই পুত্র কন্যার জ্ঞানশক্তি বা চৈতন্য শক্তি উৎপন্ন দেখা যায়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ঐরূপ সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইলে সকল পার্থেরই সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নদ, নদী, আকাশ পাতাল প্রভৃতি সৃষ্টির পার্থমাত্রেরই চৈতন্য অথবা জ্ঞানশক্তি থাকিত; তা হইলে কতকগুলিনের জ্ঞান বা চৈতন্য শক্তি আছে, আর অধিকাংশ সৃষ্টির মধ্যে ঐ জ্ঞান বা চৈতন্য থাকার কোনরূপ প্রমাণ করিতে পারা যায় না কেন?

মা। তবে এই কথাটা কি?

দ। ও কথার জবাব তো অদ্বৈতবাদ প্রকরণে একরূপ হয়ে গেছে। ভাল,ফের বল্‌ছি,ঈশ্বরের সৃষ্টিকারিণী শক্তি আর ঈশ্বর একই। যেমন আগুণের দাহিকতাশক্তি আর প্রকাশশক্তি দুই সমষ্টিকে আগুণ বলি, সেইরূপ সৃষ্টিকারিণী অনন্ত শক্তি আর অনন্ত চৈতন্য বা অনন্ত সৃষ্টিকারিণী শক্তি আর অনন্ত জ্ঞান দুই ঈশ্বরের আছে; সেই জ্ঞানশক্তি প্রভাবেই বা সেই চৈতন্যশক্তি প্রভাবেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, বা হইতেছে। জগতের সকল কার্য্য চলিতেছে, বা সম্পূর্ণ হইতেছে।

মা। বিলাতে জন্ ষ্টুওয়ার্ড মিলের একটি মত আছে যে, একটি জ্ঞানাপন্ন কারণ আছে,আর এই পরমাণু বা প্রকৃতি আছে, সেই জ্ঞানাপন্ন শক্তিই জগৎ নির্ম্মাতা, সেই নির্ম্মাতার ইচ্ছা বা কার্য্য অনেকই

ভালর দিগে দেখা যায়, এবং নির্ম্মাণ দক্ষতা আছে, চক্ষু কর্ণের কৌশল সকল দেখিলেই প্রমাণিত হয় যে, সেই নির্ম্মাতা ভাবিঅনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিয়াই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তির অভাবে প্রকৃতির গতিকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে সক্ষম নহেন; ভালর দিগে তাঁর টান আছে সত্য, কিন্তু সে টান রক্ষার ক্ষমতা তাঁর নাই ইত্যাদি; তা, কতকটা সাংখ্যদর্শনের মতন এই মতটী প্রকারান্তরে প্রকৃতি পুরুষ স্বীকার করেছেন, তবে পুরুষ অপেক্ষা অন্ধ প্রকৃতির শক্তি বা ক্ষমতা বেশী, এইটিই তিনি স্বীকার করেছেন।

স। তা তো ঠিক কথা! পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতির বল বেশী; সেই জন্যই তো পুরুষগুলো হুকুমে ছোটে, ওঠ বল্লে ওঠে, বোস্ বল্লে বসে; একবার দুফোঁটা চক্ষের জল পড়্লেই—পুরুষের গয়াগঙ্গা বারাণসী সকল হয়ে যায়, তখন পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতির বল বেশী যে তার ভুল কিছু আছে কি?

দ। সমস্ত অন্ধশক্তিকে যখন জ্ঞানশক্তি নিয়মিত করিতে পারিতেছে, তখন অন্ধশক্তির আর প্রাধান্য কোথায়? একটী ক্ষুদ্র মানুষ, বিজ্ঞান দ্বারা একটী পর্ব্বতকে উড়াইয়া দিতেছে; একটী সমুদ্রের প্রকাণ্ড তুফানকে শান্ত করিবার জন্য তৈল নিক্ষেপ দ্বারা তুফানের শান্তির চেষ্টা করিতেছে;—তাড়িতকে এক বস্তু হইতে বাহির করিয়া অপর বস্তুতে প্রবেশ করাইতেছে; হাইড্রোজন, অক্সিজন যোগে জল প্রস্তুত করিতেছে, জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া হাইড্রোজন, অক্সিজন প্রস্তুত করিতেছে; মানুষের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেলে পিতলের বা অন্য ধাতুর খুলি প্রস্তুত করে দিয়ে মানুষকে কার্য্যক্ষম করিতেছে; সাপের বিষের বিষত্ব ধ্বংস করে গুণের অংশ লইয়া জীবন রক্ষার উপাদান ঔষধি প্রস্তুত করিতেছে; রজনীগন্ধা প্রভৃতি শ্বেত ফুলের গাছের মূল চিরে দিয়ে তার ভিতরে মেটে সিঁদুর দিয়ে সেই স্থান যোড়া লাগায়ে সেই শ্বেত ফুলের গাছে

লালরঙ্গের রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল ফোটাইতেছে; দ্রব্যযোগে মাটি প্রস্তুত করে সেই মাটিতে বীজ বুনিবামাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুর হয়ে, গাছ হয়ে ডালপালা হয়ে আঁব বা অন্যবিধ বৃক্ষের মুকুল এবং ফল উৎপন্ন হয়ে সেই ফল তখনই পাকা খাইতে পারিবে, যে বৃক্ষ ৫ বর্ষে অন্ধপ্রাকৃতিক নিয়মে ফলিত, সেই গাছ, বা ফল মানব-বিজ্ঞান প্রভাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিতেছে; বিজ্ঞানবলে মানুষ স্থলচর হইয়াও খেচর, জলচর হতেছে, তখন আরও জ্ঞান-বলে মানুষ কতই কার্য্য করিয়া অন্ধপ্রাকৃতিক নিয়মকে জ্ঞানের আয়ত্তাধীন দেখাইবেন, তাহার সীমা কি? এমতস্থলে অন্ধপ্রকৃতি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য বেশী, অন্ধশক্তি বা প্রকৃতি অপেক্ষা জ্ঞানের বা চৈতন্যর শক্তি অসীম, তাহা প্রমাণিত হলে জন ষ্টুওয়ার্ড মিলের অথবা "শিবে শক্তিযুক্তং" ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতের পোষক-গণের প্রাধান্য ত দেখা যায় না, এবং প্রমাণিতও হয় না। আর কোথাও জড়শক্তি, চৈতন্য বা জ্ঞানকে নিয়মিত করিতে দেখা যায় না, প্রমাণিত হয় না, তখন জড়শক্তির চেয়ে জ্ঞানের বা চৈতন্যর প্রাধান্য বেশী এইটি একেবারে প্রমাণিত।

মা। জনষ্টুওয়ার্ড মিল সাহেবের এইটি নূতন মত নহে, এখন দেখ্‌চি যে এই মতটি আমাদের দেশেও অনেক দিন পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে; তাঁর ঐ মতটী প্রায় ঠিক সাংখ্য মতের প্রকৃতি পুরুষের মত কোন কোন হিন্দুশাস্ত্রের মতে শক্তিরই প্রাধান্য বেশী, জ্ঞানের বা পুরুষের প্রাধান্য কম, শক্তির অভাবে জ্ঞান কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ নহেন; জ্ঞানপঙ্গু, শক্তিকে আশ্রয় করিলেই জ্ঞানের কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, তখন শক্তি ভিন্ন জ্ঞানের অক্ষমতা যেমন হিন্দুমতে আছে, মিল সাহেবেরও ঠিক সেই মত তো দেখ্‌চি? তবে নূতন কৃতবিদ্য বাবুরা মিলের এত গোঁড়ামী করেন কেন?

দ। আর সে মতের অস্তিত্ব কোথায় বল? উপরে তা তো

বলা হয়েছে। বাবুরা নূতন যা দেখেন, তাই সোণার চক্ষে দেখেন; পুরাতন আমাদের দেশে কিছু ছিল কি না, আছে কি না, সে সকল খুঁজে দেখেন না, বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করেন না, যাহা পড়েন, তাহাই নূতন মনে করে আশ্চর্য্য হয়ে থাকেন। তবে মিল সাহেব বড়ই পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাঁর ঐ মতটীকে তিনি বেস সাজাইয়া গুজাইয়া লিখেছেন, ঐ মত আমাদের দেশেও ছিল, এবং আছে কিন্তু তাহা এখানে একটু, ওখানে একটু এ শাস্ত্রে একটু ও শাস্ত্রে একটু, এইরূপে আছে বলেই শীঘ্র বিদ্বান লোকে পড়ে শুনে বার করিতে পারেন না, সেই জন্যই এখনকার পণ্ডিত বাবুরা ইংরাজিতে যা দেখেন, তাই নূতন মনে করেন। কিন্তু সংস্কৃত পুস্তকে ঐ প্রকৃতিপুরুষের দুইরূপ অর্থ হয়, এক ঈশ্বরের সৃষ্টিকারিণী শক্তি আর জ্ঞানশক্তিকে প্রকৃতি পুরুষ বলা যায়, আর সাংখ্য মতের খুব নিগূঢ়ভাব দেখিলে, অন্ধ জড়শক্তি অর্থাৎ পরমাণুর শক্তি, আর চৈতন্য এই দুইকে প্রকৃতিপুরুষ বলে, তাহাতেই শক্তির মতে প্রকৃতি বা শক্তির প্রাধান্য বেশী, চৈতন্যর শক্তি কম, শক্তি অভাবে চৈতন্যে পঙ্গু; শক্তির প্রাধান্য বেশী, এই মতটীই মিল সাহেবের মতের সঙ্গে প্রায় ঠিক মিলে যায়, মিল সাহেবের মতটী তা হলে নূতন নহে, ভারতের শাক্তদিগের মতের মতন তাঁরও ঐ মতটী অথবা সেই মত থেকেই তিনি ঐ মতটী সংগ্রহ করেছেন, এই টুকুই বুঝিতে পারা যায় তা ঐ মতের প্রাধান্য নাই তা পূর্ব্বে বলিলাম তো। আরও "শরীরতত্ত্ব" প্রকরণে ও "জীবতত্ত্ব প্রকরণে" এই বিষয়টীর বেশী করে মীমাংসা করে দিবার ইচ্ছা রহিল।

স। ও ভাই দয়া! তুমি যতই কেন বল না, প্রকৃতির বলই বেশী, কেন আপনা আপনি খাটো হোস্? পুরুষগুলো যখন প্রকৃতি হারা হয়, তখন কেমন রুক্ষো খুক্ষো লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পড়ে দেখিসনি? খায় দাখে সব করে তবু যেন, হতভাগা হয়ে যায়; আর যে

দিন আনে দিন খায়, তার যদি ঘরে লক্ষ্মীশ্রী থাকে, যদি পেত্নির মতনও একটী প্রকৃতি থাকে, তারও মনের স্ফূর্ত্তি দেখ্‌দেখি? এতেই প্রমাণ হয় যে পুরুষ প্রকৃতি ছাড়া হলে অকর্ম্মণ্য হয়। লক্ষ্মীছাড়া হয় তখন প্রকৃতিরও প্রাধান্য বেশী কেন না বল? দূর্ হাবি আপনার দাবি ছাড়িস্ কেন না? যেমন প্রকৃতির একটু মেজাজ গরম হলে, অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তাপে বাতাসের পরমাণু গরম হয়ে উঠ্‌লে—ঝড় তুফান হয়ে সংসার রসাতলে যেতে বসে, চৈতন্য-শক্তি কোথায় লুকাইয়া থাকেন;—সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে এগুতে পারেন না; সেই-রূপ মেয়েজাতি—বা শর্ম্মারামদের জাতি যখন রেগে ওঠেন—মেজাজ গরম হয়ে ওঠে তখন ঘর সংসার উলটপালট হয়ে যায়, পুরুষেরা আড়ষ্টমেরে থাকেন, হয় তো ফের দশ গণ্ডা নূতন হাঁড়িকুঁড়ি কিন্‌তে হয়। এমত হলে যে প্রকৃতির বল বেশী না স্বীকার করে, সে অপ্রকৃতিস্থ লোক, তার কথা শুন্তে নাই। আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বময়কর্ত্রী।

পরকাল প্রকরণ।

মা। আচ্ছা দয়া! পরকাল থাকার প্রমাণ কি?

দা। পরকাল আছে. না থাক্‌লে কি ঈশ্বরের একটী এত বড় সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে কি? জড়জগতের মূল উপাদানের ধ্বংসের প্রমাণ যখন হয় না, তখন ঈশ্বরের প্রধান সৃষ্টি মানবজীবন বা মানবাত্মা সেটি ধ্বংস হয়ে যাবে, এটী কি কখন সম্ভব হয়?

২। আমাদের মনে ধ্বংসের ভাব আদৌ নাই;

৩। মানবাত্মা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা উত্তমতা, বা ঈশ্বরের প্রধান কৌশল জগতে আর দ্বিতীয় নাই, ঈশ্বরের যত উত্তমতা, যত কৌশল যত নিপুণতা, মানবাত্মা সৃষ্টিতেই প্রমাণিত হইয়াছে, তখন জড়জগৎ

থাকিবে, এবং মানবাত্মা ধ্বংস হইবে এটী কখন জ্ঞান ও যুক্তি, বা জ্ঞানের মধ্যে বিচারে বা বিশ্বাসে কিছুতেই যে পাই না; কোন তর্কতেও এই মতের অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। এই মতটী কোন এক জন ধর্ম্মশীল উৎকৃষ্ট বিচারজ্ঞ সাহেবের মত। আমরা জানি বিশেষ পরকাল আছে; আমরা কখন ধ্বংস হব না, এ ভাবটী একেবারে মানব প্রকৃতির সঙ্গে গাঁথা আছে, পরকাল থাকার এইটীই প্রধান প্রমাণ। জগতের শৃঙ্খলার কৌশল সঙ্গে সঙ্গে থাকে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার বিদ্যমান দেখা যায়। একালে পৃথিবীতে ঘোর পাপ করে তাহার দণ্ড হবে না, এরূপ নিয়ম্ জগতে দেখিতে পাই না, তখন পৃথিবীর কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের নিয়ম সকলের প্রণালী দেখে পরকাল থাকা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

স। যা দেখ্‌তে পাই না তা মান্‌ব কেন?

দ। আমরা তো মন জ্ঞান কিছুই দেখ্‌তে পাই না, তখন সে সকল না দেখেও যে যুক্তিতে, যে বিশ্বাসে, যে কারণে মানিব এটীও সেই যুক্তি সেই বিশ্বাস, সেই জ্ঞান সেই কারণেই মানিতে হইবে।

স। আমি না মানি যদি।

দ। মুখে না মানিলে কি হয়? সকলকেই মনে মানিতে হয়। কে এমন সত্যনিষ্ঠ পরকাল অবিশ্বাসী লোক আছেন, সত্য করে বলুন দেখি যে, তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন, এমন ভাব তাঁহার মধ্যে একটুকুও আছে?

স। পরকাল জিনিষটি কি তাই বল?

দ। আবার একখানি "জীবন্ত পরকাল" "মানব ধর্ম্ম" বলে বই লিখিব, সেই বইখানিতে সকল দেখিতে পাইবে, এখানে এখন সেই কথা মীমাংসা করিলে সেই বইখানির আর আবশ্যক হবে না, বলেই এখানে বলিব না।

স্বর্গ নরক প্রকরণ।

স। আচ্ছা দয়া! এই যে লোকে বলে "স্বর্গ নরক" তা বন্! কেউ কি তা দেখ্‌তে গেছে? না দেখে ফিরে এসে সাক্ষ্য জবানবন্দী দেছে? তা বন এমনি বিশ্বাসের গতিক একটীর নাম শুন্‌লেই ভয়, অপরটীর নাম শুন্‌লে আহ্লাদ হয় কেন বল দেখি? আচ্ছা বন্! স্বর্গে নাচ্, তামাসা, যুদ্ধ, গান, বাদ্য, কোকিল, মত, আমোদ, প্রমোদ সকলই আছে আর নরকে শোক দুঃখ আগুণ মশাল ময়লার দুর্গন্ধ শুদ্দ, সবই তো আছে, কে এটী দেখে এসেছে?

দ। শুবন! সেটী কেবল কথার কথা, যে জাতি যা ভাল বাসে, বা ঘৃণা করে, ভয় করে, তাই স্বর্গ নরক বর্ণনা হয়েছে; সেই দেশীয় শাস্ত্রকারগণ কেবল সেই দেশী মূর্খলোকদিগকে পাপ থেকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য আর ভাল কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই দেশীয় লোকের রুচির মত স্বর্গ নরকের বর্ণনা করে শাস্ত্রে লিখে রেখে দেছেন।

এই আমাদের দেশের সেকেলে লোকেরা নাচ, তামাসা, মদ, এবং যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা, গঙ্গাস্নান, ভাল বাসিতেন, রাজাকে ভক্তি করতেন, ন্যায় বিচারকে ভাল বাসতেন, স্ত্রীলোকের মান সম্ভ্রম ভাল বাসিতেন,স্বর্গেও ঠিক সেইরূপ বর্ণনা; স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ছিলেন, স্বর্গে রাজসভা হইত, দেবতারা মদ খেতেন, নাচ হয়, যুদ্ধহয়, অভি-শাপ হয়, আবার মন্দাকিনী নদী, কামধেনু গাই, তপস্যা এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দানধ্যান, অমরাবতী, অতিথিসেবা সকলই বর্ণনা করা হয়েছে; বিষ্ঠাকে ঘৃণা ছিল, আগুনে, লৌহ দণ্ড, ভয়ঙ্কর অস্ত্র, ভয় ছিল আর পাপী লোকের জন্য নরকে ঐ সকল যথেষ্ট থাকা এমনি বর্ণনা আছে। সাহেবদের দেশের লোক; তেজ ভাল বাসেন, বক্তৃতা ভাল বাসেন, নাচ ভাল বাসেন। তাদের স্বর্গে কেবল

ঈশ্বরের চারিধারে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ানই বর্ণন আছে ইডেন গার্ডেন; সবই বর্ণনা আছে; সব্ সৌখীন; নরক কেমন জান? সাহেবেরা সহজেই বেশী নির্দ্দয় ছিলেন, সেই জন্য ঈশ্বরের ও নির্দ্দয়তা বর্ণন করেছেন. তাঁরা সহজে মাতৃ ভালবাসার অনেক অঙ্গই জানে না; লালন পালন দাসীরা করে থাকে বলে ঈশ্বরের মাতৃময় ভাব তাঁদের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতেই পায় না; কেবল জ্ঞানময় পিতৃময় ভাবটী ইয়ুরোপে বেশী, তার কারণ কেবল তাঁরা লালন পালনের বঞ্চিত বলেই, বোধ হয় সেই জন্য স্বর্গেও মাতৃময় ভাবের উল্লেখও নাই ক্ষমার নামটীও নাই। প্রাচীন গ্রিক্‌দের স্বর্গে বোধ করি দেবতা শাস্ত্রের মাথার খুলিতে মদ ঢেলে দেয় ইত্যাদি নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুরতা পূর্ণ স্বর্গের বর্ণনা আছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মীদের স্বর্গেও কোর্‌মা রুটী আতর, গোলাপ, মদ, নাচ সকলই আছে স্বর্গের প্রধান পথ "কাফের বলিদান" বিধর্ম্মিকে ছেদন। এইরূপ অসভ্যদের মধ্যে নরবলিই স্বর্গের সোপান, ইত্যাদি নানা জাতির আপনাদিগের রুচির মতন স্বর্গ নরক গড়ে পীঠে ঠিকঠাক্ করেছেন।

স। তবে কি কিছু নাই কি? তবে মত্‌টী কি?

দ। কে বলে নাই? সকল অপেক্ষা প্রধান হিন্দুদিগের আসল উপনিষদ্ কালের মতটীই অতি সুন্দর কিন্তু ঐ মত পৌরাণিক মতের কাছে চাপা পড়িয়াই গিয়াছে, অনেকেই জানেন এবং ঐ বিশুদ্ধ মতটি অনেকে জানেনও না।

স। কি মত বল্ না,

দ। প্রাচীন ঋষিরা উপনিষদের এক স্থানে স্বর্গ নরকের এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন। কঃ স্বর্গঃ?

উ। সৎসঙ্গো হি স্বর্গঃ।

প্র। কো নরকঃ ?

উ। অসৎ সংসার বিষয়িসংসর্গ এব নরকঃ।

ঐ মতের অর্থ।

প্র। স্বর্গ কি ?

উ। সৎ সঙ্গই স্বর্গ।

প্র। নরক কি ?

উ। অসৎ সংসার বিষয়ীর সংসর্গই নরক।

সে কালের টীকেকারগণ এইরূপ অর্থ করে গেছেন। কিন্তু আমি ভেবে ভেবে দেখিলাম যে ঐ শ্লোকের প্রকৃত টীকা হয় নাই, শ্লোকের আরও গভীর এবং উৎকৃষ্ট টীকা হইতে পারে; বোধ হয় আমি যাহা ভেবে স্থির করিয়াছি, সেইটীই উপনিষদের প্রকৃত ভাব হইতে পারে। আমি এইরূপ টীকা করেছি যথাঃ—

"সৎ" বলিতে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকেই বুঝায়, সেই সত্যের সঙ্গবাসই "স্বর্গ" অর্থাৎ সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহবাসই স্বর্গ।

আর "অসৎ সংসার বিষয়ীর সংসর্গই নরক, এটীর প্রকৃত গূঢ় ভাব এই যে, গূঢ় অর্থ এই যে, "অসৎ কি না মিথ্যা এই যে সংসার এই সংসারই হয়েছে বিষয় যার এমন বিষয়ী যে "মন" সেই মনের সঙ্গে বাসই নরক, অর্থাৎ সর্ব্বদাই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অবিবেকী হয়ে—সংসারাসক্তিতে যার মন ডুবে থাকে, সেই প্রকৃত নরক ভোগ, অর্থাৎ সে ব্যক্তি বিবেক শক্তির সুখে চির বঞ্চিত হইয়া পাঁকে নিমগ্ন হয়ে একরূপ অসাড় অবস্থায় থাকে; তেমনি নরক আবিষ্কৃত হইতে পারে ? আমি এই স্বর্গ নরকের পক্ষপাতী এই স্বর্গ নরককেই আমি বিশ্বাস করি, তদ্ভিন্ন আর কিছু স্বর্গনরক আছে তা তো আমি জানিও না, বিশ্বাসও করি না, এটী ছাড় আর কোন স্বর্গ নরক প্রমাণও হইতে পারে না।

স। ওল্লো দয়া তুই কি আর্‌জন্মে ঋষি ছিলি না কি? তোকে কেন বন্য বেদান্তবাগীশ নাম দেয় না?

মা। আচ্ছা, আমি যদি বলি পৌরাণিক মতই সত্য, খৃষ্টান মতই সত্য, মুসলমান মতই সত্য, গ্রীকদের মতই সত্য, তার কাটান কি?

দয়া। দেখেছে কে? আর পরকাল বা স্বর্গ তো আর আকার বিশিষ্ট নহে, তখন জড় পৃথিবী ঐ সকল জড় পদার্থ সেখানে থাকা যে যুক্তিবিরুদ্ধ ন্যায়বিরুদ্ধ—বিচারবিরুদ্ধ মত?

মা। এইটিই পাকা কথা।